الدولة الإسلامية

ديوان الدعوة والمساجد

আসুন দ্বীন সম্পর্কে জানি

আসুন দ্বীন সম্পর্কে জানি

এই কিতাবটি :-
দাওয়াহ ও মাসজিদের দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

তত্ত্বাবধানে:-
আদ দালাতুল ইসলামিয়্যার গবেষণা ও ফাতওয়া বিভাগ

দ্বিতীয় সংস্করণ
রজব ১৪৩৬ হিঃ
বর্ধিত সংস্করণ এবং পরিমার্জিত

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

আসুন দ্বীন সম্পর্কে জানি

সূচিপত্র

ইসলাম

ইসলামের প্রথম রোকন হলো,

এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসুল।

'এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই' এটার অর্থ কী? এটার অর্থ হলো, আল্লাহ ব্যতীত কোন 'সত্য' মা'বুদ নেই।

ব্যাখ্যা-

অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত এমন কেউ নেই, যে কিনা এই অধিকার রাখে যে, আপনি তার জন্য কোন একটি ইবাদাত পালন করবেন। তবে এই ব্যাপারটি আরো ভালোভাবে বুঝতে হলে আমাদেরকে ইবাদাতের অর্থ জানতে হবে।

ইবাদাত হলো আল্লাহ ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন এমন প্রতিটি জিনিসের নাম। হোক সেটি কোন কথা বা কাজ, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য। (যেমন- সালাত আদায় করা, দু'আ করা, {পশু} যবেহ করা, {আল্লাহর ওপর} ভরসা রাখা ও {তাকে} ভয় করা।) সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করল, দু'আ করল কিংবা অন্য কারো উদ্দেশ্যে যবেহ করল সে আদতে লা ইলাহা ইল্লাহ'র সাক্ষ্যই বাস্তবায়ন করেনি।

তো এই মহান কালিমাটি দুইটি রোকনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে-

প্রথম রোকন হলো, لا إله (লা ইলাহা) অংশটি। যা আল্লাহ ব্যতীত ইবাদাত করা হয় এমন সমস্ত জিনিসকে নাকচ করছে। আর এটিই হলো, তাগুতকে অস্বীকার করা বা কুফর বিত ত্বগুত।

দ্বিতীয় রোকন হলো, إلا الله (ইল্লাল্লাহ) অংশটি। যা এক আল্লাহর জন্যই যাবতীয় ইবাদাতকে সাব্যস্ত করছে, যার কোন শরীক নেই।

সুতরাং একজন মানুষের জন্য আল্লাহর ইবাদাত করতে হলে প্রথমেই তাকে অবশ্যই তাগুত অস্বীকার করতে হবে। এই কথাটির দলীল হলো, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন,

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى.

{সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে সেই যেন দৃঢ় হাতল আঁকড়ে ধরল।} আল বাকারা- ২৫৬

কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাগুত কাকে বলে এবং আমরা কিভাবে তাগুতকে অস্বীকার করবো?

তাগুত - الطاغوت

- আভিধানিক অর্থে তাগুত الطاغوت **শব্দটি** الطغيان (আত তুগইয়ান) মাসদার হতে নির্গত একটি শব্দ, যার অর্থ সীমালঙ্ঘন করা।
- পারিভাষিক অর্থে তাগুত বলা হয়- একজন বান্দা যাকে কেন্দ্র করে তার সীমা অতিক্রম করে। (যাকে কেন্দ্র করে'র উদাহরণ হল-) যেমন (আল্লাহকে বাদ দিয়ে) যার ইবাদাত করা হয়, অনুসরণ করা হয় কিংবা যার আনুগত্য করা হয়।

সুতরাং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের তাগুত বলতে এমন সত্তাকে বোঝানো হয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে বাদ দিয়ে বিচারের জন্য তারা যার শরণাপন্ন হয়, কিংবা আল্লাহকে ছেড়ে তারা যার ইবাদাত করে কিংবা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ ছাড়াই তারা যার অনুসরণ করে থাকে।

তাগুতের প্রকার

তাগুত তিন প্রকারে বিভক্ত-

প্রথমতঃ ইবাদাতের তাগুত। অর্থাৎ প্রত্যেক ঐ সত্তা, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার ইবাদাত করা হয়। যেমন জ্বীন-ইনসান। জীবিত কিংবা মৃত। তবে কোন মানুষ তাগুত হওয়ার জন্য শর্ত হলো, তার যে ইবাদাত করা হচ্ছে এ ব্যাপারে তার সম্মতি থাকতে হবে। আরো উদাহরণ হলো, যেমন কোন জন্তু-জানোয়ার, কোন বৃক্ষ বা পাথরজাতীয় কোন জড় বস্তু। অথবা একটি নক্ষত্রও ইবাদাতের তাগুত হতে পারে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে এসমস্ত সত্তার উদ্দেশ্যে কোন কিছু যবেহ করা, কিংবা এগুলোর নিকট দু'আ করা, কিংবা এগুলোর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা ইত্যাদি যেকোনভাবে এগুলোর ইবাদাত করা হতে পারে। ইবাদাতের তাগুত বর্জন করার দলীল হচ্ছে,

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَ الَّذِيۡنَ اجۡتَنَبُوا الطَّاغُوۡتَ اَنۡ يَّعۡبُدُوۡهَا وَ اَنَابُوۡۤا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الۡبُشۡرٰى ۚ فَبَشِّرۡ عِبَادِ.

{আর যারা তাগুতের ইবাদাত পরিহার করে এবং আল্লাহমুখী হয় তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ।} আয যুমার- **১৭**

দ্বিতীয়তঃ শাসন বা বিচারের তাগুত। অর্থাৎ প্রত্যেক ঐ সত্তা, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার নিকট বিচার চাওয়া হয়েছে। যেমন শিরকী সংবিধান বা মানবরচিত আইন। কিংবা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া অন্য বিধান দ্বারা বিচারকারী ব্যক্তি, হোক সে কোন শাসক, জজ বা অন্য কেউ। শাসন বা বিচারের তাগুতের দলীল হলো, আল্লাহ তা’আলা বলেন,

...يُرِيۡدُوۡنَ اَنۡ يَّتَحَاكَمُوۡۤا اِلَى الطَّاغُوۡتِ.

{...তারা বিচারের জন্য তাগুতের শরণাপন্ন হতে চায়।} আন নিসা- ৬০। তিনি আরো বলেন,

اَفَحُكۡمَ الۡجَاهِلِيَّةِ يَبۡغُوۡنَ ؕ وَ مَنۡ اَحۡسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكۡمًا لِّقَوۡمٍ يُّوۡقِنُوۡنَ

{তবে কি তারা জাহেলিয়াতের বিধানই কামনা করছে? অথচ আল্লাহর চেয়ে আরো সুন্দর বিধানদাতা আর কে হতে পারে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা বিশ্বাস স্থাপন করে?} আল মায়িদা- ৫০।

তৃতীয়তঃ অনুসরণের তাগুত। এর উদাহরণ হলো, হারামকে হালাল মনে করা ও হালালকে হারাম মনে করার ক্ষেত্রে এবং তাগুতের বিধান যেমন গণতন্ত্র ও মানবরচিত আইন ইত্যাদি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ওলামায় সু’ এর অনুসরণ করা। একজন মানুষকে অবশ্যই জানতে হবে যে, আইন প্রণয়ন করার অধিকারটি শুধুই আল্লাহর সঙ্গে খাস। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَ لَا تَقُوۡلُوۡا لِمَا تَصِفُ اَلۡسِنَتُكُمُ الۡكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّ هٰذَا حَرَامٌ لِّتَفۡتَرُوۡا عَلَى اللّٰهِ الۡكَذِبَ ؕ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَفۡتَرُوۡنَ عَلَى اللّٰهِ الۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُوۡنَ.

{আর আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করার জন্য তোমাদের জবান দ্বারা বানানো মিথ্যার ওপর নির্ভর করে তোমরা বলো না যে, এটা হালাল আর এটা আরাম। নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে তারা সফলকাম হয় না।} আন নাহল- **১১৬**।

তিনি আরো বলেন,

اِتَّخَذُوۡۤا اَحۡبَارَهُمۡ وَ رُهۡبَانَهُمۡ اَرۡبَابًا مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ.

{তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম ও পাদ্রীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।} আত তাওবাহ- ৩১

এই আয়াতের তাফসীরে এসেছে যে, আহলে কিতাবের আলেম ও পাদ্রীরা আল্লাহর হারামকৃত বিষয়কে হালাল ও তাঁর হালালকৃত বিষয়কে হারাম করেছিল। আর এভাবেই মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

তাগুতের সংখ্যা অনেক। তবে প্রধান প্রধান তাগুত হলো ৫টা-

- শয়তান।
- আল্লাহর বিধান পরিবর্তনকারী শাসক। আইন প্রণেতাও একই শ্রেণীর।
- আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য বিধান দ্বারা বিচার পরিচালনাকারী।
- আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে গায়ব জানে বলে নিজেকে দাবি করে।
- আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার ইবাদাত করা হয় এমন অবস্থায় যে, সে এ ব্যাপারে সম্মত।

তাগুতকে কীভাবে অস্বীকার করব?

- এই বিশ্বাস করা যে, তাগুত বাতিল।
- তাগুতকে বর্জন করা এবং তাগুতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা (আল বারা)।
- তাগুতের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা।
- তাগুতের অনুসারীদেরকে কাফের মনে করা।
- আল্লাহর জন্যই তাগুতের অনুসারীদের সঙ্গে শত্রুতা করা।

এ ব্যাপারে দলীল হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَدۡ كَانَتۡ لَكُمۡ اُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ فِیۡۤ اِبۡرٰهِیۡمَ وَ الَّذِیۡنَ مَعَهٗ ۚ اِذۡ قَالُوۡا لِقَوۡمِهِمۡ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنۡكُمۡ وَ مِمَّا تَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ ۫ كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَ بَدَا بَیۡنَنَا وَ بَیۡنَكُمُ الۡعَدَاوَةُ وَ الۡبَغۡضَآءُ اَبَدًا حَتّٰی تُؤۡمِنُوۡا

بِاللّٰهِ وَحْدَه اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ مَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ط رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ اِلَيْكَ اَنَبْنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

{ইবরাহীম এবং তাঁর সঙ্গে যারা আছে অবশ্যই তাদের মাঝে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ, যখন তারা নিজ সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, নিশ্চই আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যা কিছুর ইবাদাত করো তা থেকে মুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করলাম এবং তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আগ পর্যন্ত চিরকালের জন্য তোমাদের আর আমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়ে গেলো। তবে ইবরাহীমের পিতাকে উদ্দেশ্য করে বলা তাঁর এই কথা ব্যতীত (অর্থাৎ আদর্শ নয়) যে, -অবশ্যই আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো। তবে আমি তোমার জন্য আল্লাহর কাছে কোন কিছুরই অধিকার রাখি না- হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ওপর নির্ভর করেছি, আপনারই অভিমুখী হয়েছি এবং ফিরে যাওয়া তো আপনারই কাছে।} আল মুমতাহিনাহ- ০৪

সুতরাং যে ব্যক্তি এই বৈশিষ্ট্য বাস্তবে রূপ না দিবে সে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী এবং তাগুতকে অস্বীকারকারী বলে গণ্য হবে না[১]। বরং উল্টোটা হবে। কেননা তাগুতের প্রতি ঈমান রাখা আবার আল্লাহর প্রতিও ঈমান রাখা এই দুইটি বিপরীতমুখী বিষয়। একজন মানুষের অন্তরে কখনোই এই দুইটি বিষয় একসঙ্গে স্থান পেতে পারে না। একই মুহূর্তে একজন ব্যক্তিকে কীভাবে মুশরিক (শিরককারী) আবার মুয়াহহিদ (তাওহীদপন্থী) বলা সম্ভব? বরং এক্ষেত্রে দুইটি নামের যেকোন একটি নামই তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে। এখানে তৃতীয় কোন নাম নেওয়ার সুযোগ নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّ مِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ط وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

---

[১] তবে তাগুতকে প্রকাশ্যে তাগুত না বলার ক্ষেত্রে কোন ওজর থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং তাকে মুসলিম হিসেবেই গণ্য করা হবে। মূলতঃ এই কথাটিতে তাগুত বর্জনের বিষয়টিতেই গুরুত্বারোপ করা উদ্দেশ্য। সেটি প্রকাশ্যে হোক বা অন্তর থেকে। তবে প্রকাশ্যে তাগুতকে তাগুত হিসেবে ঘোষণা করা ইবরাহীম আ. এর আদর্শের অংশ। -অনুবাদক

{তিনিই ঐ সত্তা, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। ফলে তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আছে কাফের আর কেউ আছে মু'মিন।} আত তাগাবুন- ০২।
তিনি আরো বলেন,

إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّ إِمَّا كَفُورًا.

{নিশ্চই আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন হয় সে কৃতজ্ঞ হবে নয়তো অকৃতজ্ঞ হবে।} আদ দাহর- ০৩।
এই হলো সেই তাগুতের পরিচয় যাকে অস্বীকার করতে এবং যাকে পরিহার করতে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে। এবং এই হলো তাগুতের সেই ইবাদাত, যা করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে এবং যা বর্জন করতে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, যার ইবাদাতকারীদেরকে কাফের মনে করতে এবং যাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে।

তবে এই কালিমা অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কয়েকটি শর্ত ব্যতীত এই কালিমার পাঠকারীর কোন কাজেই আসবে না।

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর শর্তসমূহ-

একটি কথা আপনার জানা থাকা জরুরী যে, (আল্লাহ আপনাকে তাওফীক দান করুন) এই শর্তগুলো উল্লেখের পেছনে উদ্দেশ্য এটি নয় যে, আপনি শুধু এগুলো মুখস্থ করে রাখবেন। কারণ এমন অনেক মানুষ আছেন, যাদের মাঝে এই শর্তগুলো পাওয়া যায় এবং তারা এগুলো গুরুত্বসহকারে পালনও করে থাকেন। কিন্তু যদি তাদের কাউকে বলা হয়, ‘আপনি একটি একটি করে শোনান তো’, তাহলে তিনি ভালো করে বলতে পারবেন না। আবার এমন অনেক মানুষ আছে, যারা এই শর্তগুলো ভালোভাবে মুখস্থ করে রেখেছে ঠিকই, কিন্তু এগুলোর বিপরীত কর্মকাণ্ডেও তারা হরহামেশা পতিত হচ্ছে।

১ নং শর্ত- এই কালিমার অর্থ জেনে-বুঝে বলতে হবে। না জেনে বললে হবে না। জেনে-বুঝে বলার অর্থ হলো, এই কালিমা কী কী বিষয়কে সাব্যস্ত করছে আর কী কী বিষয়কে নাকচ করছে সে ব্যাপারে ইলম থাকা।

তো এই কালিমার অর্থ কী? এই কালিমার অর্থ হলো, আল্লাহ তা’আলা ব্যতীত কোন সত্য মা’বুদ নেই। আল্লাহ তা’আলা ছাড়া মানুষ যেসমস্ত মা’বুদের ইবাদাত করে ঐ সকল মা’বুদ বাতিল। এই শর্তটির দলীল হলো, আল্লাহ তা’আলা বলেন-

وَ لَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ.

{আর তিনি ছাড়া তারা যাদেরকে ডাকে, তারা সুপারিশের মালিক হবে না, তবে তারা ছাড়া, যারা ‘জেনে-বুঝে’ সত্য সাক্ষ্য দেয়।} আয যুখরুফ- ৮৬। তিনি আরো বলেন-

فَاعْلَمْ اَنَّه لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ط وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَ مَثْوٰىكُمْ.

{কাজেই ‘জেনে’ রাখুন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য মা’বুদ নেই। আর ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ও মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য। আল্লাহ্ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।} মুহাম্মাদ- **১৯**। রসুলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, সে জানে আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ নেই সেই জান্নাতে যাবে।" সহীহ মুসলিম- ২৬

২ নং শর্ত- দৃঢ় বিশ্বাস বা একীন থাকতে হবে; সন্দেহের কোন স্থান দেওয়া যাবে না। সুতরাং এই কালিমা পাঠকারী ব্যক্তির জন্য এই কালিমা কী বোঝাচ্ছে সে ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে। এমন দৃঢ় বিশ্বাস, যাতে সন্দেহের কোন স্থান নেই। কারণ ঈমানের ক্ষেত্রে শুধু একীনই কাজে আসে। এক্ষেত্রে ধারণা কোন কাজে আসে না। যদি তাই হয় তাহলে -আল্লাহ পানাহ- একজন মানুষের মাঝে সন্দেহ প্রবেশ করলে তো কোন কথাই নেই[1]। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ.

{মু'মিন তো কেবল তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারপর তারা কোন সন্দেহে পতিত হয়নি এবং যারা তাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী।} আল হুজুরাত- ১৫। এক হাদীসে নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু হুরায়রা রা.কে বলেছেন,

اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ.

"তুমি আমার এই জুতাজোড়া নিয়ে যাও। এই দেয়ালের পেছনে তুমি যাকেই দেখবে, সে লা ইলাহা ইল্লাহ এর সাক্ষ্য দিচ্ছে এমন অবস্থায় যে, এ ব্যাপারে তাঁর অন্তর দৃঢ় বিশ্বাসী তুমি তাকেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করবে।" সহীহ মুসলিম- ৩১। অন্য এক রেওয়াতে আছে,

لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"যে ব্যক্তিই দুই শাহাদাহ (সাক্ষ্য) নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করবে এমন অবস্থায় যে, সে এই দুই শাহাদাহ এর ব্যাপারে সন্দিহান নয় সেই জান্নাতে

---

[1] কারণ এক্ষেত্রে সন্দেহ ধারণার চেয়েও খারাপ একটি জিনিস।

প্রবেশ করবে।” সহীহ মুসলিম- ২৭

৩ নং শর্ত- এই কালিমা পাঠ করার পাশাপাশি এমন ইখলাস অন্তরে থাকতে হবে, যার সঙ্গে কোন শিরকের মিশ্রণ নেই। ইখলাস কী জিনিস? ইখলাস হলো, বিশুদ্ধ নিয়তের মাধ্যমে যাবতীয় আমলকে শিরকের সব রকম মিশ্রণ থেকে মুক্ত করা। ফলে একজন বান্দা তার সমস্ত ইবাদাত কেবল আল্লাহর জন্যই করবে। কিন্তু সে যদি কোন একটি ইবাদাত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করে, যেমন কোন নবী, ওলী, ফেরেশতা, মূর্তি, জ্বীন বা অন্য যে কারো জন্যই হোক, তাহলে সে আল্লাহর সঙ্গে শিরকে লিপ্ত হবে এবং এই শর্তটি ভঙ্গ করবে, অর্থাৎ ইখলাসের শর্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ.

{সুতরাং আপনি আল্লাহর জন্য দ্বীনকে খালেস করে তাঁর ইবাদাত করুন।} আয যুমার- ০২। তিনি আরো বলেন,

وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ.

{আর যারা তাদের রবের সঙ্গে শিরক করে না।} আল মু'মিনুন- ৫৯। রসুলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ.

"কেয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভে সবচেয়ে ধন্য হবে ঐ ব্যক্তি, যে অন্তর থেকে খালেসভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে।" সহীহ বুখারী- ৯৯। অন্য এক হাদীসে আছে,

مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করা অবস্থায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করবে সে জাহান্নামে যাবে।" সহীহ মুসলিম- ৯৩

৪ নং শর্ত- সত্যবাদিতা পোষণ করতে হবে। মিথ্যার কোন স্থান দেওয়া যাবে না। এই সত্যবাদিতার অর্থ হলো, এই কালিমা পাঠকারী ব্যক্তি অন্তর থেকে সত্যি সত্যিই তা পাঠ করবে। এক্ষেত্রে তার যবান আর অন্তর একই

রকম থাকবে। যদি এমন হয় যে, সে শুধু মুখেই এই কালিমা পাঠ করছে, কিন্তু অন্তর থেকে এই কালিমার অর্থের প্রতি এখনো বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তাহলে সে একজন মুনাফেক বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُه ط وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ.

{যখন মুনাফেকরা আপনার নিকট আসে তখন তারা বলে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসুল। আল্লাহও জানেন যে, আপনি তাঁর রাসুল। কিন্তু আল্লাহই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিঃসন্দেহে মুনাফেকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।} আল মুনাফিকুন- ০১। হাদীসে এসেছে,

مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.

“যদি কেউ অন্তর থেকে সত্যি সত্যি এই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা’বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল তাহলে আল্লাহ অবশ্যই জাহান্নামের জন্য তাকে হারাম করে দিবেন।” সহীহ বুখারী- ১২৮।

৫ নং শর্ত- এই কালিমাকে গ্রহণ করে নিতে হবে। প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। অর্থাৎ এই কালিমা যা কিছু বোঝায়, তা অন্তর ও যবানের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে এবং এতে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। (মক্কার) মুশরিকরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ জানত, কিন্তু তারা এই কালিমাকে গ্রহণ করেনি। ফলে আল্লাহ তাদেরকে নিন্দা করে আয়াত নাযিল করেছেন-

إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ.

{নিশ্চই যখন তাদেরকে বলা হতো যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা’বুদ নেই তখন তারা অহংকারবশতঃ মুখ ফিরিয়ে নিতো।} আস সাফফাত- ৩৫

৬ নং শর্ত- এই কালিমাকে মেনে নিতে হবে। বর্জন করা যাবে না। অর্থাৎ এই কালিমা যা কিছু বোঝায় এমন সমস্ত বিষয়ের প্রতি এই কালিমা পাঠকারী আনুগত্য প্রদর্শন করবে। ফলে সে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত

করবে। তাঁর শরীয়াহ অনুযায়ী আমল করবে। তাঁর শরীয়াহর প্রতি ঈমান আনবে এবং এই আক্বীদা রাখবে যে, এটিই হক্ক। গ্রহণ করা আর মেনে নেওয়ার মাঝে পার্থক্য হলো, মেনে নেওয়া বলতে কর্মের মাধ্যমে মেনে নেওয়া বোঝানো হচ্ছে আর গ্রহণ করা বলতে এই কালিমার অর্থ যে সঠিক তা যবানের মাধ্যমে প্রকাশ করা বোঝানো হচ্ছে। তবে এই দুইটিরই সারাংশ হলো, ইত্তিবা' বা দ্বীন ইসলামের অনুসরণ। তবে ইনকিয়াদ বা মেনে নেওয়া বলতে আত্মসমর্পণ করা এবং কোন জিনিস বর্জন না করা বোঝায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ.

{আর তোমরা তোমাদের রবের নিকট ফিরে আসো এবং তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করো।} আয যুমার- ৫৪। তিনি আরো বলেন,

وَ مَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَه اِلَى اللهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ط وَ اِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ.

{যে কেউ সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে, সে আসলে এক মজবুত হাতল ধারণ করে। আর যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহর অধীনে।} লুকমান- ২২। রসুলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"আমি যখন তোমাদেরকে কোন কিছু করতে নিষেধ করব তখন সেটা তোমরা পরিহার করবে। আর যখন তোমাদেরকে কিছু করতে আদেশ করব তখন তোমরা যতটুকু পারো তা পালন করবে।" সহীহ বুখারী- ৬৮৫৮

৭ নং শর্ত- মহব্বত ও ভালোবাসা পোষণ করতে হবে। ঘৃণা ও বিদ্বেষ রাখা যাবে না। সুতরাং একজন বান্দার ওপর আবশ্যক হলো, তিনি আল্লাহকে ভালোবাসবেন। আল্লাহ যা কিছু ভালোবাসেন তাও ভালোবাসবেন। আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তাকেও ভালোবাসবেন। বান্দা তাওহীদের এই কালিমাকে ভালোবাসবেন। এই কালিমার দাবিকৃত

বিষয়গুলো এবং এই কালিমা যা কিছু বোঝায় এমন সব কিছুকে বান্দা ভালোবাসবেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ.

{আর যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকে অধিক ভালোবাসে।} আল বাকারা- **১৬৫**। হাদীসে আছে,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার সন্তান-সন্ততি, পিতা ও সকল মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হই।" সহীহ মুসলিম- ৪৪

এতোক্ষণ আমরা প্রথম শাহাদাহ অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর আলোচনা শুনলাম। এবার আমরা দ্বিতীয় শাহাদাহ অর্থাৎ 'ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রসুলুল্লাহ' এর আলোচনা শুনবো।

মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসুল এই সাক্ষ্য প্রদান-

কিভাবে আপনি 'মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসুল' এই সাক্ষ্য বাস্তবে রূপ দিবেন?

- আপনাকে জানতে হবে তিনি কে? তিনি হলেন, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, ইবনে হাশেম। আল্লাহ তাকে জগতবাসীর উদ্দেশ্যে সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী হিসেবে এবং একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকারূপে পাঠিয়েছেন। তিনি হলেন, সর্বশেষ নবী ও রাসুল এবং সমগ্র মাখলুকাতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক।
- তিনি আমাদেরকে যা করতে আদেশ করেছেন আমরা সে ব্যাপারে তাঁর আনুগত্য করব এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা আমরা পরিহার করে চলব। সুতরাং যেসমস্ত নির্দেশনা রসুলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে আমাদের নিকট এসেছে সেগুলো পালন করা আমাদের ওপর ওয়াজিব। তেমনি তিনি আমাদেরকে যা যা করতে নিষেধ করেছেন সেগুলো বর্জন করা ও পরিহার করাও আমাদের ওপর ওয়াজিব।

রসুলুল্লাহ সা. এর যাবতীয় আদেশ দুই প্রকার-

একটি হলো, যা তিনি আমাদেরকে আবশ্যকভাবে করতে বলেছেন। এটির নাম ওয়াজিব।

আরেকটি হলো, যা তিনি আমাদেরকে করতে বলেছেন ঠিকই, তবে আবশ্যকভাবে নয়। এটির নাম মুস্তাহাব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ مَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَ مَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

{রাসুল তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং তিনি তোমাদেরকে যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চই আল্লাহ কঠিন শাস্তির অধিকারী।} আল হাশর- ০৭

- রাসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনতে হবে। তিনি আমাদেরকে যেসব ঘটনা শুনিয়েছেন সেগুলো বিশ্বাস করতে হবে। ঐ ঘটনাগুলো আগে ঘটে থাকুক বা আগামীতে ঘটবে এমন হোক, সব ঘটনাই বিশ্বাস করতে হবে। রাসুলকে শক্তি যোগাতে হবে এবং তাকে সম্মান করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِه وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ ط وَ تُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا

{যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনো, তাঁর শক্তি যোগাও এবং তাকে সম্মান করো; আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর (আল্লাহর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।} আল ফাতহ- ০৯। আমরা কেবল নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত পদ্ধতি অনুসারেই আল্লাহর ইবাদাত করব। কারণ আমরা কেবল ইবাদাত করলেই আল্লাহ তা কবুল করেন না। তবে যদি ইবাদাত শুধু আল্লাহর জন্যই হয় এবং নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শরীয়াহ নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন তার মুয়াফেক (অনুযায়ী) হয় তবেই আল্লাহ তা কবুল করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِه اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَة اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

{কাজেই যারা তাঁর আদেশের অন্যথা করে তারা সতর্ক হোক যে, কোন বিপর্যয় তাদের ওপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।} আন নুর- ৬৩। নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ.

"যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের ভেতর এমন জিনিস প্রবেশ করাবে যা এর অন্তর্ভূক্ত নয় তাহলে ঐ জিনিস প্রত্যাখ্যাত হবে।" সহীহ বুখারী- ২৫৫০

- এই বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনি পরিপূর্ণভাবে দ্বীনকে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কোনরূপ ত্রুটি

করেননি। এও বিশ্বাস করতে হবে যে, তাঁর দাওয়াত সকল মানুষের জন্য ব্যাপক[১]।

- এই বিশ্বাসও করতে হবে যে, তাঁর মৃত্যুর পর যে ব্যক্তি নিজেকে নবী দাবী করবে সে মিথ্যাবাদী ও কাফের। যে তার কথা বিশ্বাস করবে এবং তার অনুসারী হবে সেও কাফের। এও বিশ্বাস করতে হবে, নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন। এ কথার দলীল হলো, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ اِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ.

{নিঃসন্দেহে আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে।} আয যুমার- ৩০

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদার রসুলাল্লাহ (لا إله إلا الله محمدا رسول الله) এই মহান কালিমাটিকে আহলুল ইলম কালিমাতুত তাওহীদ হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন। কালিমাতুত তাওহীদ শব্দটি মূলত নবী সা. এর একটি হাদীস থেকে উপলব্ধ। নবী সা. যখন দশম হিজরীতে মুয়ায ইবনে জাবাল রা.কে ইয়েমেনে পাঠাচ্ছিলেন তখন তাকে বললেন,

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ.

"তুমি কিন্তু আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছো। সুতরাং তুমি তাদেরকে এই সাক্ষ্য প্রদানের জন্য দাওয়াত দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল।" সহীহ মুসলিম- **১৯**। এই হাদীসের অন্য এক রেওয়াতে আছে, إلى أن يوحدوا الله অর্থাৎ "(তুমি তাদেরকে দাওয়াত দিবে) যেন তারা আল্লাহকে এক বলে মেনে নেয়।" সহীহ বুখারী- ৬৯৩৭

---

[১] অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোন জনপদ বা গোষ্ঠির জন্য নয়, যেমন পূর্বের নবী-রাসুলগণের অবস্থা ছিলো।

তাওহীদ - التوحيد

তাওহীদ অর্থ কী? তাওহীদ অর্থ হলো,

إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات.

অর্থাৎ রুবুবিয়্যাহ, উলুহিয়্যাহ এবং আসমা ও সিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক মনে করা।

ব্যাখ্যা-

বান্দা এই বিশ্বাস রাখবে এবং এই স্বীকৃতি দিবে যে, একমাত্র আল্লাহই সমস্ত কিছুর রব ও মালিক। তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, সমস্ত জগতের একমাত্র পরিচালক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই যাবতীয় ইবাদাতের একমাত্র হক্বদার। তাঁর কোন শরীক নেই। আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত মা'বুদ বাতিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই পরিপূর্ণ গুণের অধিকারী। যেকোন ধরণের দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম ও মহান মহান গুণ। বান্দা যবানের মাধ্যমে এই বিষয়গুলোকে সত্যায়ন করবে আর তার কাজ-কর্ম এই বিষয়গুলোকে বাস্তবে রূপ দিবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى.

{আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ নেই। তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম।} ত্বহা- ০৮। তিনি আরো বলেন,

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبَادَتِه ط هَلْ تَعْلَمُ لَه سَمِيًّا.

{[তিনি] আসমান ও যমিনসমূহ এবং এতোদুভয়ের মাঝে সমস্ত কিছুর রব। সুতরাং আপনি তাঁর ইবাদাত করুন এবং তাঁর ইবাদাতে ধৈর্যশীল থাকুন। আপনি কি তাঁর সমনামগুণসম্পন্ন কাউকে জানেন?} মারইয়াম- ৬৫

তাওহীদের কিছু ফজীলত-

- যে ব্যক্তি তাওহীদ বাস্তবায়ন করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কারণ নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

  مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ،

  وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ.

  “যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দেবে যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা’বুদ নেই, যার কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসুল, এবং ঈসা আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি মারইয়ামের নিকট নিক্ষেপ করেছেন এবং তাঁর রূহ; আরো এই সাক্ষ্য দিবে যে, জান্নাত হক্ক, জাহান্নাম হক্ক, তাহলে তার আমল যাইহোক আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।” সহীহ বুখারী- ৩২৫২

- তাওহীদ অর্জনের ফলে একজন মানুষ জাহান্নামে কখনো চিরকাল থাকবে না, যদি তার অন্তরে সরিষাদানা পরিমাণ ঈমান বিদ্যমান থাকে। শাফা’আতের হাদীসে আছে যে, রাসুল সা. বলেছেন,

  اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ.

  “(আল্লাহ বলবেন) তোমরা যাও। যার অন্তরে তোমরা কণা পরিমাণ ঈমান পাবে তাকে তোমরা জাহান্নাম থেকে বের করো।” সহীহ বুখারী- ৭০০১

- তাওহীদ অর্জনের দ্বারা একজন বান্দা দুনিয়া ও আখেরাতে পরিপূর্ণ হিদায়াহ ও নিরাপত্তা লাভ করে। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

  اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ لَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَ هُمْ مُّهْتَدُوْنَ.

  {যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুম মিশ্রিত করেনি তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।} আল আন’আম- ৮২

- তাওহীদ একজন বান্দাকে মাখলুকের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে। মাখলুকের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত হওয়া, মাখলুককে ভয় করা, মাখলুকের কাছেই আশাবাদী হওয়া এবং তাদের জন্য কাজ করা ইত্যাদি থেকে তাওহীদ একজন বান্দাকে মুক্ত রাখে। এটিই হলো আসল ইযযত ও বিশাল মর্যাদার ব্যাপার। পাশাপাশি বান্দা আল্লাহকেই মা'বুদ মানে। আল্লাহরই ইবাদাত করে। আল্লাহর নিকটই আশা রাখে। তাকেই ভয় করে এবং তাঁর কাছেই ফিরে আসে। সর্বোপরি এসকল কিছুর মধ্য দিয়েই একজন বান্দার সফলতা অর্জিত হয়।
- তাওহীদের আরো কয়েকটি উপকারী দিক হলো, এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে। নবী সা. এর শাফা'আত লাভে সবচেয়ে ধন্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়। বিপদ-আপদ দূরীভূত হওয়া এবং পূর্বের সকল গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য তাওহীদ অনেক বড় একটি কারণ। এটুকুই নয়, বরং সমস্ত মৌখিক ও কর্মগত ইবাদাত কবুল হওয়া পরিপূর্ণ তাওহীদ অর্জনের ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّه حَيٰوة طَيِّبَة ج وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

{মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে, অবশ্যই আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব। আর অবশ্যই আমি তাদেরকে তারা যা করত তার তুলনায় সুন্দরতর প্রতিদান দেব।} আন নাহল- ৯৭।

তাওহীদ তিন প্রকারে বিভক্ত-

১- তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ-

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ হলো, আল্লাহর যাবতীয় কর্মের ব্যাপারে তাকে এক মনে করা। যেমন, সৃষ্টি করা, মালিক হওয়া, পরিচালনা করা এবং রিযিক দান করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ مَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ط فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ج فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ.

{আপনি বলে দিন, কে তোমাদেরকে আসমান ও যমিন থেকে রিযিক দান করেন, কে কর্ণ ও চক্ষুর মালিক, কে মৃত থেকে জীবিতকে এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন এবং কে সব কিছু পরিচালনা করেন? অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ! তাহলে আপনি বলে দিন, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না?} ইউনুস- ৩১

২- তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ-

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ হলো, আল্লাহকে ইবাদাতের একমাত্র হক্বদ্বার মনে করা। যেমন সালাত আদায় করা, (পশু) যবেহ করা ও মান্নত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. لَا شَرِيْكَ لَه ج وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ.

{আপনি বলুন, নিশ্চই আমার সালাত, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন-মৃত্যু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য, যার কোন শরীক নেই। এ ব্যাপারেই আমি আদিষ্ট হয়েছি। আমি প্রথম আত্মসমর্পণকারী।} আল আন'আম- **১৬২, ১৬৩**

৩- তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত-

এর অর্থ হলো, আমরা আল্লাহকে সেই গুণেই ভূষিত করবো যে গুণের মাধ্যমে তিনি তাঁর কিতাবে কিংবা রাসুলের যবানে নিজেকে ভূষিত করেছেন। এক্ষেত্রে আমরা কোন বিকৃতির আশ্রয় নেবো না, কোন সিফত অস্বীকার করবো না, কোন সিফতের ধরণ বর্ণনা করবো না এবং কোন

সিফতের সঙ্গে কোন কিছুকে তুলনা করবো না। এই সিফতগুলোর দাবি অনুযায়ী আমরা আল্লাহর ইবাদাত করবো[১]। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ لِلّٰهِ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰى فَادۡعُوۡهُ بِهَا ۪ وَ ذَرُوا الَّذِيۡنَ يُلۡحِدُوۡنَ فِيۡۤ اَسۡمَآئِهٖ ؕ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ.

{আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। সুতরাং তোমরা সেসব নামেই তাকে ডাকো। আর যারা তাঁর নাম সম্বন্ধে বক্রপথ অবলম্বন করে তাদেরকে বর্জন কর, তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে অবশ্যই দেওয়া হবে।} আল আ'রাফ- **১৮০**। তিনি আরো বলেন,

لَيۡسَ كَمِثۡلِهٖ شَيۡءٌ ۚ وَ هُوَ السَّمِيۡعُ الۡبَصِيۡرُ.

{তাঁর মতো কোন কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।} আশ শুরা- **১১**। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা আরো বলেন,

وَ لَهُ الۡمَثَلُ الۡاَعۡلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ وَ هُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ.

{আসমান ও যমিনসমূহে সর্বোচ্চ গুণাগুণ তারই। এবং তিনিই পরাক্রমশালী, মহা প্রজ্ঞাবান।} আর রুম- ২৭

---

[১] অর্থাৎ, এই সিফতগুলোর অর্থসমূহ যে আক্বীদা-বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করে আমরা তা ধারণ করব। আল্লাহ ভালো জানেন অনুরূপ কথা আল্লাহর নামসমূহের ব্যাপারেও।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-

অনেক মুশরিকও তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, কিন্তু এতে করে তারা ইসলামে প্রবেশ করতে পারেনি। বরং নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, তাদের জান-মাল ও ঘরবাড়ি দখল করা বৈধ মনে করেছেন এবং তাদের নারীদেরকেও বন্দী করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ لَئِنۡ سَاَلۡتَهُمۡ مَّنۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ لَیَقُوۡلُنَّ اللّٰهُ.

{আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আসমান ও যমিন কে সৃষ্টি করেছেন তাহলে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ!} লুকমান- ২৫। তিনি আরো বলেন,

وَ مَا یُؤۡمِنُ اَكۡثَرُهُمۡ بِاللّٰهِ اِلَّا وَ هُمۡ مُّشۡرِكُوۡنَ.

{তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে এমন অবস্থায় যে, তারা মুশরিক।} ইউসুফ- ১০৬। সুতরাং যদিও তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ এর স্বীকৃতি দেওয়াও একজন মানুষের ওপর ওয়াজিব, তথাপি তাওহীদ বাস্তবায়নের জন্য শুধু এটুকু যথেষ্ট নয়। বরং তাওহীদের প্রত্যেকটি প্রকারই তাকে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.

"আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আদেশ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল এবং যতক্ষণ না তারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। তারা যখন এগুলো করবে তখন তারা আমার কাছ থেকে তাদের জান-মাল নিরাপদ করে নিতে পারবে, তবে ইসলামের কোন স্বার্থ ব্যতীত[১]। আর তাদের হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর।" সহীহ বুখারী- ২৫

[১] ইসলামের স্বার্থ ব্যতীত বলতে যেমন, কেউ অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমকে হত্যা করল বা বিবাহিত অবস্থায় কোন মুসলিম ব্যাভিচার করল। এমতাবস্থায় তো ইসলামী বিধি-বিধানের =

তাওহীদের আলোচনা শেষ। এখন আমাদের আলোচনা করতে হবে তাওহীদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো নিয়ে। তো ঐ জিনিসগুলো কী কী যা তাওহীদকে ভঙ্গ করে দেয়? এবং তাওহীদ ভঙ্গকারী এই বিষয়গুলোর কী কী প্রকার রয়েছে?

= স্বার্থে তাকে হত্যা করতেই হবে, যদিও সে মুখ দিয়ে কালিমা পাঠ করে এবং সালাত ও যাকাতের আমল করে।

ইসলাম ভঙ্গকারী কারণসমূহ-

আমরা ইসলাম ভঙ্গকারী প্রতিটি কারণ একটু বিস্তারিত আকারে উল্লেখ করবো।

ইসলাম ভঙ্গকারী কারণ ১- শিরক

শিরক দুই প্রকার-

প্রথম প্রকার হলো, শিরকে আকবার বা বড় শিরক।

শিরকে আকবারের সংজ্ঞা- **আভিধানিক** অর্থে শিরক শব্দটি দুই বা ততধিক জিনিস থাকা বোঝায়। যা মূলত ইনফিরাদ বা একা থাকার বিপরীত একটি বিষয়। অর্থাৎ কোন জিনিস দুই বা ততধিক বিষয়ের মাঝে অবস্থান করা; এককভাবে আছে এমন নয়। যেমন আমরা যদি বলি, لا تشرك بالله (তুমি আল্লাহর সঙ্গে শিরক করো না) তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়, তুমি আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ বানিও না এভাবে যে, তুমি তাকেও আল্লাহর অংশীদার বানিয়ে দিবে। সুতরাং যে ব্যক্তি সৃষ্টিজগতের কাউকে না কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে সে মূলত আল্লাহর সঙ্গে ঐ ব্যক্তিকে অংশীদার বা শরীক বানিয়ে ফেলল।

পারিভাষিক অর্থে শিরকে আকবার বলা হয়, বান্দা আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কোন সত্তাকে তাঁর সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করা, যাকে সে আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ, উলুহিয়্যাহ কিংবা আসমা ও সিফাতের ক্ষেত্রে সমান মনে করে।

শিরকের হুকুম- নিঃসন্দেহে শিরক হলো আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার মতো সবচেয়ে বড় গুনাহ। এটি সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ। সবচেয়ে বড় জুলুম। কারণ শিরক করার অর্থ হলো, আল্লাহর নিরংকুশ হক্ব অর্থাৎ ইবাদাতকে অন্য কারো জন্য পালন করা কিংবা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার সঙ্গেই খাস এমন কোন সিফত বা বৈশিষ্ট্য আল্লাহর কোন মাখলুকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

اِنَّ الشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيۡمٌ.

{নিঃসন্দেহে শিরক অনেক বড় জুলুম।} লুকমান- **১৩**। একারণেই শরীয়াহ শিরকের কারণে বেশ কিছু ভয়াবহ পরিণাম ও শাস্তি নির্ধারণ করেছে। এগুলোর মধ্য হতে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিচে পেশ করা হলো-

১- শিরককারী ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না যদি সে তওবা না করে মারা যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِه وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ط وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا.

{নিশ্চই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শিরক করা ক্ষমা করবেন না, কিন্তু এর চেয়ে কম যেকোন গুনাহ আল্লাহ যার ব্যাপারে চান ক্ষমা করে দিবেন। আর যে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে সে ভীষণভাবে গোমরাহ হয়।} আন নিসা- **১১৬**

২- শিরককারী ব্যক্তি দ্বীন-ইসলাম থেকে খারেজ। তার জান হরণ করা এবং তার মাল ভোগ করা হালাল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَ خُذُوْهُمْ وَ احْصُرُوْهُمْ.

{যখন হারাম মাসসমূহ অতিক্রান্ত হবে তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে সেখানেই হত্যা করবে। তাদেরকে আটক করবে এবং ঘেরাও করবে।} আত তাওবা- ০৫

৩- আল্লাহ তা'আলা মুশরিকের কোন আমল কবুল করবেন না। সে যা আমল করেছে সব কিছু বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের ব্যাপারে বলেছেন,

وَ قَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا.

{আমি তাদের কৃতকর্মগুলোর প্রতি অভিমুখী হয়ে তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দিবো।} আল ফুরক্বান- ২৩

৪- মুশরিক পুরুষের জন্য কোন মুসলিম নারীকে বিবাহ করা হারাম। এমনিভাবে কোন মুসলিম পুরুষের জন্যও কোন মুশরিক নারীকে বিবাহ করা হারাম। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ط وَ لَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ج وَ لَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ط وَ لَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَكُمْ.

{মুশরিক নারীরা ঈমান আনার আগ পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না। একজন মু'মিন দাসীও একজন মুশরিক নারীর চেয়ে উত্তম, যদিও মুশরিক নারী তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। এবং তোমরা (তোমাদের নারীদেরকে) মুশরিক পুরুষদের সাথেও বিবাহ দিও না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনছে। একজন মু'মিন দাস একজন মুশরিকের চেয়েও উত্তম, যদিও মুশরিক পুরুষ তোমাদেরকে মুগ্ধ করে।} আল বাকারা- ২২১। তবে এক্ষেত্রে শরীয়াহর সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-নীতি মেনে আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী-খৃষ্টানদের নারীদেরকে বিবাহ করার বিধান বাদ যাবে।

৫- মুশরিক মারা গেলে তাকে গোসল দেওয়া যাবে না। কাফন পরানো যাবে না। তার জানাযা পড়া যাবে না। এমনকি মুসলিমদের কবরস্থানেও তাকে দাফন করা যাবে না। বরং লোকালয় থেকে দূরে কোন এক জায়গায় একটি গর্ত খুঁড়ে সেখানেই তাকে দাফন করা হবে, যাতে করে তার দুর্গন্ধ মানুষকে কষ্ট না দেয়।

৬- জান্নাতে প্রবেশ করা মুশরিকের জন্য হারাম। বরং সে চিরকাল জাহান্নামের আগুনে অবস্থান করবে। আল্লাহর নিকট আমরা এ থেকে মুক্তি ও নিরাপত্তা কামনা করি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِنَّه مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة وَ مَاْوٰىهُ النَّارُ ط وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ.

{নিশ্চই যে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করবে অবশ্যই আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন। তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। আর জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।} আল মায়িদা- ৭২

বড় শিরকের কয়েকটি প্রকার

বড় শিরকের প্রধান তিনটি প্রকার রয়েছে-

- **প্রথম প্রকার- রুবুবিয়্যাহর ক্ষেত্রে শিরক।**

অর্থাৎ আল্লাহর একচ্ছত্র মালিকানা, পরিচালনা করা, সৃষ্টি করা কিংবা রিযিক দান করা ইত্যাদি কর্মের কিছু অংশ হলেও অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। একচ্ছত্র শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এগুলো এমনভাবে অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যা কেবল আল্লাহর শানেই শোভা পায়।
রুবুবিয়্যাহ এর ক্ষেত্রে শিরক কখনো কথার দ্বারা, কাজের দ্বারা কিংবা বিশ্বাসের দ্বারা হয়ে থাকে। নিচে রুবুবিয়্যাহ এর ক্ষেত্রে শিরকের কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো-

১। খৃষ্টানদের শিরক। যারা বলে আল্লাহ তিনজনের একজন। এবং মাজূসীদের শিরক। যারা সমস্ত ভালো ঘটনার উৎস মনে করে নুরকে। তাদের নিকট নুর হলো, প্রশংসিত মা'বুদ। আবার তারা সমস্ত অকল্যাণমূলক ঘটনার উৎস মনে করে অন্ধকারকে।

২। জ্যোতির্বিদ্যা বা জ্যোতিষশাস্ত্র। অর্থাৎ এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা ছাড়াও কেউ গায়েব জানে। এগুলোর অন্তর্ভূক্ত হবে ঐ ব্যক্তির কর্মকাণ্ড, যে ব্যক্তি পত্র-পত্রিকায় 'আজকের রাশিফল' বা 'এ সপ্তাহ আপনার কেমন যাবে?' ইত্যাদি ফিচারগুলো বিশ্বাস করে।

৩। অনেক কট্টর সুফী ও কবরপূজারী শীয়াদের শিরক। তারা এই আক্বীদা রাখে যে, কোন কোন মৃত ব্যক্তিদের রূহ মৃত্যুর পরও বিভিন্ন কাজ করে থাকে। যেমন, প্রয়োজন পুরণ করা এবং বিপদাপদ দূর করা। কিংবা তারা এই আক্বীদা রাখে যে, তাদের কতিপয় মাশায়েখ বিশ্ব পরিচালনার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজ করে কিংবা কেউ সাহায্য চাইলে তাকে সাহায্য করে, যদিও সে সাহায্যপ্রার্থীর সামনে উপস্থিত না থাকে।

৪। যারা বিভিন্ন সংবিধান ও মানবরচিত আইন-কানুন তৈরি করে এবং এগুলোর কাছে বিচার চাওয়া মানুষের ওপর আবশ্যক করে। (এটি

রুবুবিয়্যাহ এর মধ্যে শিরক) এদের অবস্থা মূলত ফেরাউনের মতো। ফেরাউন বলেছিলো, আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় রব।

- **দ্বিতীয় প্রকার- আল্লাহর নাম ও সিফতের ক্ষেত্রে শিরক।**

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় নাম ও গুণাবলির মধ্য থেকে কোন একটির ক্ষেত্রে আল্লাহর অনুরূপ কাউকে বানানো অথবা মাখলুকের কোন সিফত আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। এই শিরক কথার মাধ্যমে, কাজের মাধ্যমে কিংবা বিশ্বাসের মাধ্যমে হতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য আল্লাহর কোন নাম নির্ধারণ করবে কিংবা আল্লাহর সঙ্গে খাস এমন কোন সিফত বা গুণ অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে সে ব্যক্তি আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে মুশরিক বলে গণ্য হবে। অনুরূপ কেউ যদি শুধু মাখলুকের কোন একটি সিফত আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তাহলে সে আল্লাহর সিফতের ব্যাপারে মুশরিক বলে গণ্য হবে। নিচে আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে শিরকের কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো-

১। কিছু কিছু শীয়া ও কট্টর সুফীদের আক্বীদা হলো, কোন কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তিকে ডাকা হলে যে সময়েই বা যে স্থান থেকেই ডাকা হোক না কেন তারা সে ডাক শুনতে পায়।

২। গায়েব জানে বলে দাবি করার মাধ্যমে কিংবা এই আক্বীদা পোষণ করার মাধ্যমে শিরক করা যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়াও অন্য কেউ গায়েব জানে। যেসমস্ত বিষয়ে সৃষ্টিজগত অবগতি লাভ করেনি এবং পঞ্চেন্দ্রীয় দ্বারা যেসমস্ত বিষয় সম্পর্কে কেউ জানেনি তা-ই ইলমুল গায়বের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ط وَ مَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ.

{আপনি বলে দিন, আসমান ও যমিনসমূহে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েব জানে না। এবং তারা জানেও না যে, কবে তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।} আন নামল- ৬৫

সুতরাং যে ব্যক্তি দাবি করবে যে, কোন মাখলুক গায়েব জানে সেই ব্যক্তিই শিরকে আকবারে পতিত হবে, যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দিবে।

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েব জানার দাবি করার মাধ্যমে শিরক হওয়ার কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো-

ক. এই আক্বীদা পোষণ করা যে, নবীগণ কিংবা কতিপয় ওলী-আউলিয়া বা নেককার ব্যক্তি গায়েব জানেন। আপনি এর নজীর খুঁজে পাবেন শীয়া ও সুফীদের মাঝে। এজন্যই আপনি দেখবেন যে, তারা নবীগণ ও মৃত ব্যক্তিদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তারা বিশ্বাস করে যে, তারা সকলেই তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানেন। তারা তাদের কথা শোনেন। অথচ এগুলো সবই শিরকে আকবার, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

খ. জ্যোতিষীপেশা। জ্যোতিষী হলো এমন ব্যক্তি, যে গায়েব জানে বলে নিজেকে দাবি করে। এর কাছাকাছি অবস্থানে আছে, আররাফ عراف , রম্মাল رمال , জাদুকর ও কুহহান[১]। সুতরাং কেউ কোন সংবাদ প্রদান করা ছাড়াই যে ব্যক্তি অজানা কোন বিষয় জানে বলে নিজের ব্যাপারে দাবি করবে কিংবা কোন কিছু ঘটার পূর্বেই ঘটার বিষয়টি সে জানে বলে দাবি করবে সে শিরকে আকবারের মুশরিক বলে গণ্য হবে। চাই সে 'পাথর মেরে'[২] জানার দাবি করুক কিংবা হাত দেখে কিংবা কাপ দেখে বা অন্য কোন উপায়ে। এ সবই শিরক। নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَن أتى عرَّافًا أو كاهنًا فصدَّقه بما يقول، فقد كَفَرَ بما أُنزِلَ على محمَّدٍ.

---

[১] আররাফ একটি ব্যাপক শব্দ। এর অর্থ এক কথায় যে গায়েব জানার দাবি করে। রম্মাল বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যে বালুর ওপর বিভিন্ন রেখা টেনে বিভিন্ন গায়েবি বিষয় দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। জাদুকরকে এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করার কারণ হলো, জাদুকর জ্বীনের মাধ্যমে গায়েবী বিষয় বলার চেষ্টা করে। কুহহান শব্দটি কাহিন كاهن এর বহুবচন। অর্থ- জ্যোতিষী।

[২] একজন লোক কিছু পাথর মাটি বা বালুর ওপর নিক্ষেপ করে। পাথরগুলো অগোছালো অবস্থায় পতিত হওয়ার পর লোকটি পাথরগুলোর অবস্থান দেখে একটা চিত্র দাঁড় করানোর চেষ্টা করে এবং এর মাধ্যমে সে কোন একটা গায়েবী বিষয় বোঝার চেষ্টা করে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এটি স্রেফ ভণ্ডামি হলেও এখানে গায়েব জানার দাবি করা হয়। আর এটিই শিরকে আকবার।

"যে ব্যক্তি জ্যোতিষী বা গণকের কাছে আসবে এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করবে সে যেন ঐ জিনিস অস্বীকার করলো যা মুহাম্মাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে"। মুসতাদরাকে হাকেম[১]- ১৫।

- **তৃতীয় প্রকার- উলুহিয়্যাতের ক্ষেত্রে শিরক।**

অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো জন্য কোন একটি ইবাদাত করা কিংবা এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ কোন একটি ইবাদাত পাওয়ার অধিকার রাখে। এটিও কথা, কাজ কিংবা বিশ্বাসের মাধ্যমে হতে পারে।

১- কথার মাধ্যমে যেমন, আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো কাছে দু'আ করা, মান্নত করা কিংবা অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া।

২- কাজের মাধ্যমে যেমন, আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো জন্য সেজদা করা, যবেহ করা কিংবা কবর তাওয়াফ করা। যারা এগুলো করবে তারা শিরকে আকবারে পতিত হবে, যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হয় যে তারা মুসলিমদের অন্তর্ভূক্ত।

৩- বিশ্বাসের মাধ্যমে যেমন, ভয় করা, শিরকমিশ্রিত ভালোবাসা পোষণ করা কিংবা আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো ওপর ভরসা করা।

---

[১] হাকেম রহ. এটিকে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী রহ. একমত হয়েছেন। প্রকা. দারুর রিসালাহ।

শিরকের দ্বিতীয় প্রকার হলো- শিরকে আসগর বা ছোট শিরক

শিরকে আসগরের **সংজ্ঞা** হলো, শরীয়াহ যে জিনিসটিকে শিরক বলে আখ্যায়িত করেছে, কিন্তু দলীলের মাধ্যমেই আবার এই বিষয়টি প্রমাণিত যে, শিরকযুক্ত এই বিষয়টি মানুষকে ইসলাম থেকে খারেজ করে দেয় না। তবে এ জাতীয় শিরক ইসলাম থেকে ব্যক্তিকে খারেজ না করলেও তাওহীদকে ত্রুটিযুক্ত করে। এমন শিরককারী ব্যক্তির হুকুম গুনাহগার তাওহীদপন্থী ব্যক্তিদের হুকুমের মতোই। অর্থাৎ তার জান-মাল (অন্য মুসলিমের জন্য ভোগ করা) হালাল হবে না। তবে এ জাতীয় শিরক যে আমলে থাকে সেই আমলটিকে সে নষ্ট করে দেয়। যেমন কেউ কোন আমল করলো, অথচ তার উদ্দেশ্য হলো মানুষের প্রশংসা কুঁড়ানো। কিংবা কেউ সুন্দর করে সালাত আদায় করলো, সাদাকা করলো, সিয়াম রাখলো কিংবা আল্লাহর যিকির করলো শুধু এইজন্য যে, মানুষ তাকে দেখবে, তার কথা শুনবে কিংবা তার প্রশংসা করবে। এটাকেই রিয়া বা লৌকিকতা বলে। এই রিয়া যখন কোন আমলের সঙ্গে মেশে তখন সেই আমলকে সে বরবাদ করে দেয়। কিংবা কেউ গাইরুল্লাহর নামে কসম খেলো। গাইরুল্লাহর নামে কসম খাওয়ার হুকুমে এটিও পড়বে যে, কেউ বলল, ‘আল্লাহ যা চান এবং অমুক যা চান’ কিংবা ‘যদি আল্লাহ ও অমুক ব্যক্তি না হতেন’ কিংবা ‘এটি আল্লাহ ও অমুক ব্যক্তির কারণে’ কিংবা ‘আল্লাহ ও অমুক ব্যক্তি ছাড়া আমার আর কেউ নেই’ এ জাতীয় যত বাক্য আছে। তবে এক্ষেত্রে যেটি বলা আবশ্যক তা হলো, ‘আল্লাহ যা চেয়েছেন তারপর অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছেন’। এভাবেই সবগুলো বাক্য বলতে হবে।

সতর্কীকরণ- ছোট শিরক কখনো কখনো বড় শিরকে পরিণত হয়ে যায়। সুতরাং একজন মুসলিমের ওপর ওয়াজিব হলো, তিনি সব ধরণের শিরক থেকেই বেঁচে থাকবেন।

শিরকের কিছু সুরত, যেগুলো থেকে বেঁচে থাকা চাই-

১। বালা-মুসিবত দূর হওয়ার নিয়তে আংটি বা কাইতন (তাগা বা সূতা) পরিধান করা।

২। বদনজর থেকে বাঁচার জন্য ছেলে-মেয়েদের গায়ে তাবিজ ঝুলানো। পুঁতি, হাড্ডি বা কাগজে লিখা যেকোন তাবিজ হোক।

৩। তাতায়্যুর (التطير) অর্থাৎ পক্ষিকুল, মানুষ কিংবা কোন স্থান বা অন্য কোন কিছুর কারণে কুলক্ষণ গ্রহণ করা বা এগুলোকে অশুভ মনে করা। এটা শিরক। কারণ এতে করে ভালো-খারাবির সম্পর্ক গায়রুল্লাহর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। অর্থাৎ যে মাখলুক নিজেরই কোন উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখে না সেই মাখলুকের পক্ষ থেকে অপকার 'সৃষ্ট' হওয়ার আক্বীদা রাখা হয়। এটি মূলত শয়তানের কুমন্ত্রণা ও ওয়াসওয়াসা। এটি তাওয়াক্কুলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

৪। বৃক্ষ, পাথর, ঐতিহাসিক কোন জিনিস, কবর বা এজাতীয় কিছু থেকে বারাকাহ হাসিল করা। এভাবে বারাকাহ তলব করা, বারাকাহর আশা করা এবং এসমস্ত জিনিসে বারাকাহ আছে বলে বিশ্বাস করা শিরক। কারণ এটা বারাকাহ হাসিলের ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার মতো।

৫। আত তানজীম (التنجيم)। তানজীম অর্থ হলো নুজুম (নক্ষত্র) এর সাহায্যে বৈশ্বিক বিভিন্ন ঘটনা ও সংবেদনশীল বিভিন্ন জিনিসের ব্যাপারে প্রমাণ লাভ করা। তানজীমের কিছু প্রকার রয়েছে। যেমন-

> **প্রথমত, ইলমুত তা'ছীর علم التأثير।** এর অর্থ হলো, এই বিশ্বাস করা যে, বিভিন্ন ঘটনা ঘটার ক্ষেত্রে নক্ষত্রের ভূমিকা রয়েছে। যেমন কেউ এই আক্বীদা পোষণ করলো যে, অমুক নক্ষত্র প্রভাব বিস্তারকারী। তা কোন জিনিস সৃষ্টি করতে পারে আবার মেরেও ফেলতে পারে। তাই এটি কুফরে আকবার বা বড় কুফর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ.

{জেনে রাখো, সৃষ্টি করা ও আদেশপ্রদান তাঁরই কাজ।} আল আ'রাফ- ৫৪

অথবা নক্ষত্রের গতিবিধি বিচার করে বিভিন্ন গায়েবী বিষয় কিংবা আগামিতে ঘটবে এমন কোন বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ করা। যেমন কেউ বলল, 'মিথুন রাশিতে যে জন্মগ্রহণ করবে সে অবশ্যই সুখী হবে।' 'কন্যারাশিতে যে বিবাহ করবে তার বিবাহ ভেঙ্গে যাবে।' এটাও বড় কুফর ও শিরক। কেননা এতে করে ইলমে গায়বের দাবি করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ط وَ مَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ.

{আপনি বলে দিন, আসমান ও যমিনসমূহে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েব জানে না। এবং তারা জানেও না যে, কবে তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।} আন নামল- ৬৫

দ্বিতীয়ত, ইলমুত তাসয়ীর علم التسيير। এর অর্থ হলো, নক্ষত্রের গতিবিধি বিচার করে বিভিন্ন দ্বীনী কল্যাণমূলক বিষয়ে প্রমাণ গ্রহণ করা। যেমন, কিবলার দিক জানা কিংবা সালাতের ওয়াক্ত হয়েছে কিনা জানা। এটার হুকুম হলো ফরজে কিফায়া। একজন প্রয়োজনগ্রস্ত লোকের জন্য এই ইলম শিক্ষা করা মুস্তাহাব। নক্ষত্রের গতিবিধি বিচার করে দুনিয়াবী বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজে প্রমাণ গ্রহণ করারও একই বিধান। যেমন, রাস্তা চেনা ও দিক সম্পর্কে জানা।

৬। ইস্তিসকা' বিননুজুম। এর অর্থ হলো, নক্ষত্রের নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করা। এক্ষেত্রে আক্বীদার বিভিন্নতার দিক লক্ষ্য রেখে হুকুমও বিভিন্ন রকম হবে। নিচে এ ব্যাপারে বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো-

- এই আক্বীদা রাখা যে, অমুক নক্ষত্রই হলো বৃষ্টির স্রষ্টা ও বৃষ্টি বর্ষণকারী। এটা রুবুবিয়্যাহর ক্ষেত্রে শিরকে আকবার। দলীল হলো আল্লাহ তা'আলা বলেন,

  هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ.

  {আল্লাহ ব্যতীত আর কি কোন সৃষ্টিকর্তা রয়েছে?} আল ফাতির- ০৩। এখানে প্রশ্ন করা হলেও মূলত উদ্দেশ্য হলো বিষয়টিকে নাকচ

করা। অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। তো মানুষ যখন বলবে যে, নক্ষত্র বৃষ্টি তৈরি করে তাহলে তো সে নক্ষত্রকে খালেক হিসেবে বিশ্বাস করল। আরেকটি দলীল হলো, এই ব্যাপারে ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা।

- নক্ষত্র বৃষ্টি তৈরি করে এই আক্বীদা না রাখলেও বৃষ্টি বর্ষণ হওয়ার জন্য নক্ষত্রের নিকট দু'আ করা এবং নক্ষত্রের কাছে সাহায্য চাওয়া। এটা হলো উলুহিয়্যাহ এর ক্ষেত্রে বড় শিরক। কারণ এভাবে গায়রুল্লাহর কাছে এমন কিছু চাওয়া হয়, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ দিতে পারে না। যেমন কেউ বলল, 'হে অমুক নক্ষত্র, আমাদেরকে সিঞ্চিত করো। আমাদের ওপর বৃষ্টি নাযিল করো।' আরবের কিছু লোক নক্ষত্রের নিকট দু'আ করত। তাই আল্লাহ তা'আলা বললেন,

وَ اَنَّه هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى.

{আর তিনি শি'রা নক্ষত্রের রব।} আন নাজম- ৪৯। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকা বা আর কারো নিকট দু'আ করা যাবে না- মর্মে দলীল হলো, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَّ اَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا.

{আর নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। কাজেই আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না।} আল জ্বীন- ১৮। তিনি আরো বলেন,

وَ مَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَه بِه ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُه عِنْدَ رَبِّه ط اِنَّه لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ.

{আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য মা'বুদকে ডাকে, যে বিষয়ে তার নিকট কোন প্রমাণ নেই; তার হিসাব তো তার রবের নিকটই আছে; নিশ্চয় কাফেররা সফল হবে না।} আল মু'মিনুন- ১১৭

- কারণ বানানো। অর্থাৎ আল্লাহই মূলত বৃষ্টি বর্ষণ করেন বলে বিশ্বাস, কিন্তু কোন নক্ষত্রকে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার কারণ বানানো। অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণের পর কোন নক্ষত্রের উদয় বা অস্ত যাওয়াকে বৃষ্টি বর্ষণের কারণ হিসেবে নির্ধারণ করা। এর হুকুম হলো, এটি ছোট

শিরক আর কুফর হিসেবে ছোট কুফর। এটাকে কুফরুন নি'মাহ বা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কুফর বলে।

- কোন গায়েবী সংবাদ প্রদান করার বিষয়টি নক্ষত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। যেমন এমন কথা বলা যে, অমুক নক্ষত্র দেখা দিলে অবশ্যই বৃষ্টি বর্ষিত হবে। এটা বড় শিরক। কেননা এতে করে গায়েবের সংবাদ প্রদান করা হয়। জ্যোতিষী এই কাজটাই করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ.

{আপনি বলে দিন, আসমান ও যমিনসমূহে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েব জানে না। এবং তারা জানেও না যে, কবে তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।} আন নামল- ৬৫। এই মাসআলাটি 'আত তানজীম' এর মাসআলার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আগের প্রকারের সঙ্গে এই প্রকারের পার্থক্য হলো, এই প্রকারটিতে এমন একটি ব্যাপারে সংবাদ প্রদান করা হচ্ছে, যা আগামিতে ঘটবে। পক্ষান্তরে আগের প্রকারে যখন বৃষ্টি বর্ষণ হয় তখন বৃষ্টি বর্ষণের কারণ হিসেবে কোন নক্ষত্রকে নির্ধারণ করা হয়। আবার হুকুমের ক্ষেত্রেও পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ আগের প্রকারটি শিরকে আসগর আর এটি শিরকে আকবার।

- কোন সময়কে কারণ বানানো। অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণ হওয়ার সময় হিসেবে কোন নক্ষত্র উদিত হওয়ার সময় নির্ধারণ করা। এক্ষেত্রে নক্ষত্রটি বৃষ্টির কারণ নয় এবং বৃষ্টির স্রষ্টাও নয়। বরং শুধু এটুকু যে, বৃষ্টি বর্ষণ হওয়ার সময় হলো অমুক নক্ষত্র উদিত হওয়া। যেমন কেউ বলল, 'আমাদের নিকট বৃষ্টি বর্ষণ হওয়ার সময় হলো সুরাইয়া তারকা উদিত হওয়ার সময়।' অথবা 'সুহাইল তারকা উদিত হলে বৃষ্টি বর্ষণ হবে[১]।' সুহাইল একটি প্রসিদ্ধ নক্ষত্রের নাম।

---

[১] আগের সুরত আর এই সুরতের মাঝে পার্থক্য হলো, আগের সুরতে জ্যোতিষী এমন একটি তারকা উদিত হলে বৃষ্টি হবে বলে সংবাদ দেয়, যেই তারকা উদিত হলে বৃষ্টি হওয়ার কোন প্রচলন নেই। পক্ষান্তরে এই সুরতের পূর্বাপর দেখে বোঝা যায় যে, এখানে এমন তারকা উদিত হলে বৃষ্টি হবে বলা হচ্ছে যে তারকা উদিত হলে অমুক অঞ্চলে বৃষ্টি হওয়ার একটা=

এই প্রকারটির হুকুমের ব্যাপারে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। আহলুল ইলমের মধ্যে কেউ এটিকে জায়েজ বলেছেন আর কেউ এটিকে মাকরূহ মনে করেছেন যাতে শিরক পর্যন্ত বিষয়টি না গড়ায়।

৭। শিরকের আরেকটি সুরত হলো, সময়কে গালমন্দ করা। নানা অপছন্দনীয় বিষয় ও দুর্বিষহ ঘটনার কারণে কেউ যদি সময়কে গালমন্দ করে তাহলে এটা হারাম হবে। কিন্তু যদি বিশ্বাস করে যে, সময়ই মূলত এই সমস্ত ঘটনা ঘটাচ্ছে তাহলে এটা শিরকে আকবার।

৮। এমন স্থানে আল্লাহর ইবাদাত করা যেখানে গায়রুল্লাহর ইবাদাত করা হয়। যেমন, এমন স্থানে আল্লাহর জন্য কোন প্রাণী যবেহ করা যেখানে গায়রুল্লাহর জন্য যবেহ করা হয়। এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে। পক্ষান্তরে গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ দেওয়া শিরকে আকবার।

=প্রচলন আছে। এই সুরতে তারকাকে বৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা বা কারণ কিছুই মনে করা হয় না। শুধু বৃষ্টি হওয়ার সময় বোঝানোর জন্য তারকার কথা আলোচিত হয়। যেমন কেউ বলল, শীতকালে দিন ছোট হয়ে আসবে। এটি গায়েবের সংবাদ নয় এবং দিন ছোট হওয়ার পেছনে শীতকালকেও কারণ বলা হচ্ছে না। এখানে কেবলই দিন ছোট হওয়ার সময়কাল বোঝানোর উদ্দেশ্যে শীতকালের কথা বলা হয়েছে। নতুবা দিন ছোট-বড় করার মালিক তো আল্লাহই। আল্লাহই ভালো জানেন।

উসীলা বানানো বা তাওয়াসসুল (التوسل) এর আলোচনা

তাওয়াসসুলের আভিধানিক অর্থ- কোন জিনিসের মাধ্যমে কোন জিনিসের নৈকট্য লাভ করা। যেমন, কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোন জিনিসকে উসীলা বানিয়ে অন্য কোন ব্যক্তির নৈকট্য লাভ করলো।

তাওয়াসসুলের পারিভাষিক অর্থ- একজন দু'আকারী ব্যক্তির তাঁর দু'আয় এমন কিছু উল্লেখ করা, যে জিনিসের কারণে সে তার দু'আ কবুল হওয়ার আশা রাখে।

তাওয়াসসুল দুই প্রকার-

প্রথম প্রকার- শরীয়াহসম্মত তাওয়াসসুল। এটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো-

১। আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলিকে উসীলা বানানো। এমনটি করতে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই নিম্নোক্ত আয়াতে আদেশ করেছেন-

وَ لِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَ ذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْۤ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

{আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। সুতরাং তোমরা সেসব নামেই তাকে ডাকো। আর যারা তাঁর নাম সম্বন্ধে বক্রপথ অবলম্বন করে তাদেরকে বর্জন কর, তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে অবশ্যই দেওয়া হবে।} আল আ'রাফ- **১৮০**

২। একজন উসীলাকারী ব্যক্তির তাঁর ঈমান ও নেক আমলকে আল্লাহর নিকট উসীলা বানানো। যেমন আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের সম্পর্কে বলেছেন,

رَبَّنَاۤ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ.

{হে আমাদের রব! আমরা তো এক আহ্বানকারীকে ঈমানের জন্য এভাবে আহ্বান করতে শুনেছি যে, তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনো। ফলে আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং হে আমাদের রব! আপনি আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন, আমাদের পাপ মোচন করুন এবং নেককারদের

কাতারে শামিল করে আমাদের মৃত্যু দিন।} আলে ইমরান- **১৯৩**। বনী ইসরাইলের ঐ তিন ব্যক্তির ঘটনাসম্বলিত হাদীসেও এ ব্যাপারে দলীল পাওয়া যায়, গুহার ভেতরে থাকা অবস্থায় একটি পাথর যাদের গুহামুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। তারা বের হতে পারছিলেন না। ফলে তারা আল্লাহর নিকট তাদের নেক আমলকে উসীলা বানালেন। তাই আল্লাহ তাদের গুহামুখ খুলে দিলেন আর তারা হাঁটতে হাঁটতে বের হয়ে গেলেন।

৩। আল্লাহর নিকট তাঁর একত্ববাদ বা তাওহীদকে উসীলা বানানো। এই প্রকার উসীলা ইউনুস আ. গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

{তখন সে অন্ধকারে ডাকল এই বলে যে, আপনি ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ নেই। আপনি কতই না পবিত্র।} আল আম্বিয়া- ৮৭

৪। নিজের দুর্বলতা, প্রয়োজন ও আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতাকে উসীলা বানানো। যেমন আইয়ুব আ. বলেছিলেন,

وَ اَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّه اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ.

{আমি তো দুঃখ-কষ্টে পড়েছি আর আপনি তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।} আল আম্বিয়া- ৮৩

৫। নেককার ব্যক্তিদের কাছে দু'আ চাওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট তাদেরকে উসীলা বানানো। যেমন সাহাবায় কেরাম যখন খরায় (অনাবৃষ্টিতে) পড়তেন তখন তারা নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুরোধ করতেন, যেন তিনি তাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করেন। তো রাসুল যখন মৃত্যুবরণ করলেন তখন তারা এই অনুরোধ রাসুলের চাচা আব্বাস রা.কে করতেন এবং তিনিও তাদের জন্য দু'আ করতেন[১]।

৬। নিজের অপরাধ স্বীকারকে আল্লাহর নিকট উসীলা বানানো।

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَغَفَرَ لَه ط اِنَّه هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

[১] দেখুন সহীহ বুখারী- ৯৬৪

{তিনি বললেন, হে আমার রব! আমি তো নিজের ওপর জুলুম করে ফেলেছি। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। নিশ্চই তিনি অধিক ক্ষমাশীল, চির দয়াময়।} আল ক্বসস- ১৬

দ্বিতীয় প্রকার- শরীয়াহপরিপন্থী তাওয়াসসুল।

শরীয়াহপরিপন্থী তাওয়াসসুল বলা হয়, কোরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত হয়নি এমন কোন কিছুকে উসীলা বা মাধ্যম বানানো। নিম্নে কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো-

১- মৃত ব্যক্তিদেরকে উসীলা বানানো জায়েজ নেই। ওমর ইবনে খাত্তাব রা. ও মুয়াবিয়াহ ইবনে আবু সুফইয়ান রা. এবং তাদের সমসাময়িক অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীগণ হতে বর্ণিত আছে, তারা যখন খরায় পড়তেন তখন তারা আব্বাস রা. ও ইয়াযিদ ইবনুল আসওয়াদ রা. এর মতো জীবিত ব্যক্তিদের নিকট বৃষ্টি বর্ষণের জন্য দু'আর আবেদন করতেন। তাদেরকে উসীলা বানাতেন এবং তাদের নিকট দু'আ চাইতেন। অর্থাৎ তারা এসকল ব্যক্তিদের নিকট দু'আ চাইতেন, কিন্তু তাদের সত্তাকে উসীলা বানাতেন না। তারা কিন্তু রাসুলের মৃত্যুর পর তাকে উসীলা বানাননি, তাঁর কাছে দু'আ চাননি এবং তাঁকে উসীলা বানিয়ে বৃষ্টি বর্ষণের দু'আও করেননি। তাঁর কবরের নিকটও নয়, কিংবা অন্য কোন স্থানেও নয়। বরং এক্ষেত্রে তারা বিকল্প উপায় অবলম্বন করেছেন। যেমন তারা আব্বাস রা. ও ইয়াযিদ ইবনুল আসওয়াদ রা. এর নিকট দু'আ চেয়েছেন। ওমর রা. বলেন,

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، قَالَ فَيُسْقَوْنَ.

"হে আল্লাহ! আমরা তো ইতোঃপূর্বে আমাদের নবীকে আপনার নিকট উসীলা বানাতাম, ফলে আপনি আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করতেন। তবে আমরা এখন আমাদের নবীজির চাচাজানকে আপনার নিকট উসীলা বানাচ্ছি, সুতরাং আপনি আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন। ফলে তখন বৃষ্টি নাযিল হতো।" সহীহ বুখারী- ৯৬৪। সুতরাং বোঝা গেলো, শরীয়াহসম্মত পন্থায় তাওয়াসসুল করা যখন তাদের পক্ষে অসম্ভব হলো,

তখন তারা এর বিকল্প একটি বিষয় খুঁজে নিলেন। তাদের পক্ষে এ ব্যাপারটি খুবই সম্ভব ছিলো যে, তারা নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের নিকট এসে তার মাধ্যমে তাওয়াসসুল করবেন যদি সেটা জায়েজ হতো। যেহেতু তারা এটি করেননি তাই এটি একটি দলীল যে, মৃত ব্যক্তিদেরকে উসীলা বানানো জায়েজ নেই।

২। নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান কিংবা অন্য কারো সম্মানকে উসীলা বানানো জায়েজ নেই। এ ব্যাপারে যে হাদীসটি শোনা যায় যে, إذا سألتم الله فاسألوا الله بجاهي، فإن جاهي عند الله عظيم. "যখন তোমরা আল্লাহর নিকট চাইবে তখন আমার সম্মানের উসীলা দিয়ে চাও, কারণ আল্লাহর নিকট আমার সম্মান অনেক বড়" এই হাদীসটি একটি মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস। কোন আহলুল ইলম এটি উল্লেখ করেননি। যেহেতু এই হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা সহীহ নয় তাই এই কাজটিও জায়েজ নয়। কারণ যাবতীয় ইবাদাত একমাত্র সহীহ দলীলের মাধ্যমেই সাব্যস্ত হয়।

৩। কোন মাখলুকের সত্তাকে উসীলা বানানো জায়েজ নেই। অনুরূপ তাদের হক্ক বা অধিকারকেও উসীলা বানানো জায়েজ নেই। কারণ এ ব্যাপারে নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে কোন কিছু বর্ণিত হয়নি।

মাখলুকের নিকট ইস্তি'আনা (استعانة) ও ইস্তিগাছা (استغاثة) এর হুকুম

ইস্তি'আনা হলো, কোন ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়া।

ইস্তিগাছা হলো, বিপদে পড়ে মাখলুকের সাহায্য চাওয়া এবং বিপদ দূর করার জন্য বলা।

এগুলো দুই প্রকার-

প্রথম প্রকার, এমন বিষয়ে মাখলুকের সাহায্য চাওয়া যে বিষয়ে মাখলুক সাহায্য করতে সক্ষম। এটি জায়েজ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى.

{তোমরা ভালো কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করো।} আল মায়িদা- ০২। মুসা আ. এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِه عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّه.

{অতঃপর মুসার দলের লোকটি ওর শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করল।} আল ক্বসস- ১৫। এছাড়াও যেমন মানুষ যুদ্ধ কিংবা অন্য কোন ক্ষেত্রে তার সাথীদের সাহায্য চেয়ে থাকে, অর্থাৎ যেসমস্ত কাজ মাখলুক করতে সক্ষম।

দ্বিতীয় প্রকার, এমন ক্ষেত্রে মাখলুকের কাছে সাহায্য চাওয়া, যে ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত কোন মাখলুক সাহায্য করতে সক্ষম নয়। যেমন মৃত ব্যক্তিদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। রোগমুক্তি, বিপদাপদ দূরীকরণ ও যেকোন ক্ষতি রোধ করার মতো কাজ, যা কোন মাখলুকের পক্ষে সম্ভব নয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে জীবিত ব্যক্তিদের কাছে সাহায্য চাওয়া। এই প্রকারটি জায়েজ নয়; বরং এটি হলো বড় শিরক। এর দলীল হলো, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ لَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَ لَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ.

{আপনি আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন কিছুকে ডাকবেন না, যা আপনার কোন উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারবে না। যদি আপনি তা করেন তাহলে আপনি জালেমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবেন।} ইউনুস- ১০৬।

ইসলাম ভঙ্গকারী কারণ ২- কুফর

কুফরের **আভিধানিক** অর্থ হলো, ঢেকে দেওয়া গোপন করা। কুফর দুই প্রকার- কুফরে আকবর ও কুফরে আসগর।

প্রথম প্রকার- কুফরে আকবর বা বড় কুফর।

এটি মূলত ঈমানের বিপরীত বিষয়। বড় কুফর বলা হয় এমন প্রতিটি আক্বীদা, বক্তব্য, কাজ ও বর্জনকে (অর্থাৎ কোন কাজ না করাকে) যা মানুষকে দ্বীন থেকে বের করে দেয়।

১। কুফরী আক্বীদার উদাহরণ হলো, যেমন কেউ এমন আক্বীদা পোষণ করল যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য নবী সা. এর শরীয়াহ হতে বের হওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিংবা এই আক্বীদা রাখা যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দ্বারা বিচার করা জায়েজ। কিংবা এই আক্বীদা পোষণ করা যে, অন্য কোন শাসনব্যবস্থা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার শরীয়াহর চাইতে উত্তম বা এর সমপর্যায়ের। কিংবা নবী সা. যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার মধ্য থেকে কোন একটি বিষয়কে ঘৃণা করা যদিও সে ঐ বিষয়টির ওপর আমল করে থাকে। কিংবা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার শত্রুদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা ইত্যাদি।

২। কুফরী বক্তব্যের উদাহরণ হলো, যেমন কেউ আল্লাহ, তাঁর দ্বীন-ইসলাম, কিংবা নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে উপহাস করল কিংবা গালি দিলো। (উপহাসকারীরা যা বলে তার চেয়ে আল্লাহ অনেক অনেক ঊর্ধ্বে)।

৩। কুফরী কাজের উদাহরণ হলো, যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার নাযিলকৃত বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা বিচার করা। কিংবা কোন আইন-কানুন প্রণয়ন করা, এগুলো দ্বারা বিচার করা কিংবা মানুষকে এগুলোর শরণাপন্ন হতে আদেশ করা। অথবা পূর্ব পুরুষ বা নিজ বংশের সংস্কৃতি দ্বারা বিচার করা কিংবা যারা গায়রুল্লাহর শরীয়াহ দ্বারা বিচার করে তাদের কথাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার শরীয়াহর ওপর প্রাধান্য দিয়ে তাদের বিচার মেনে নেওয়া। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির মতো অবস্থা,

যে আল্লাহর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা না করার প্রতি আহ্বান করল কিংবা মানবরচিত বিধান প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানাল কিংবা কাফের-মুশরিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার আহ্বান জানাল।

৪। কোন কাজ না করার দ্বারা কুফরী হওয়ার উদাহরণ হলো, সালাত ত্যাগ করা। সাহাবায় কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে সালাত ত্যাগ করা কুফরী।

বড় কুফরের বিভিন্ন প্রকার-

কুফরের অনেক প্রকার রয়েছে। তবে নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকার উল্লেখ করা হলো,

- **অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কুফর**

অর্থাৎ মন থেকে কিংবা যবান দ্বারা দ্বীনের কোন মৌলিক বিষয়, কোন বিধান, কিংবা সুনিশ্চিতভাবে জ্ঞাত কোন সংবাদকে অস্বীকার করা। যেসমস্ত বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার কিতাবে সুস্পষ্ট বক্তব্য এসেছে কিংবা সুনিশ্চিতভাবে কোন মুতাওয়াতির[১] হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
এর একটি উদাহরণ হলো, এমন কোন কাজ করা, যে কাজ দ্বীনের কোন কিছুকে অস্বীকার করা বোঝায়। এই প্রকারের কিছু উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো-

ক. ঈমানের কোন একটি রোকন কিংবা দ্বীনের মৌলিক কোন বিষয়কে অস্বীকার করা। অথবা এমন কোন বিষয়কে অস্বীকার করা, যা আল্লাহ কোরআনে বলেছেন কিংবা যে বিষয়ে মুতাওয়াতির কোন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ কিংবা উলুহিয়্যাহকে অস্বীকার করা। অথবা আল্লাহর এমন কোন নাম বা সিফত অস্বীকার করা, যে ব্যাপারে অকাট্যভাবে ইজমা' হয়েছে। যেমন আল্লাহর 'ইলম' বা জানা এই সিফতকে অস্বীকার করা। অথবা ইজমা' এর মাধ্যমে প্রমাণিত কোন ফেরেশতার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। যেমন, জিবরিল, মিকাইল আলাইহিমাস সালাম

---

[১] অর্থাৎ এমন বৃহৎ জনসংখ্যার বর্ণিত হাদিস, যাদের সবাই একমত হয়ে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করবে এটা অসম্ভব, সনদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ সংখ্যা বিদ্যমান থাকলে হাদীসটিকে মুতাওয়াতির বলা হয়।

বা তাদের মতো কেউ। এই প্রকারের মধ্যে আরো অন্তর্ভূক্ত হবে, ইহুদী-খৃষ্টান বা তাদের মতো অন্য কাফেরদের ধর্মগুলোকে সঠিক মনে করা। অথবা তাদেরকে কাফের মনে না করা। কিংবা এমন কথা বলা যে, তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে না। আরো অন্তর্ভূক্ত হবে, নিজেকে অন্য ধর্মাবলম্বী হিসেবে পরিচয় দেওয়া। যেমন কেউ বলল, আমি খৃষ্টান। আবু বকর রা. এর সাহাবী হওয়াকে অস্বীকার করা। সকল কিংবা কিছু সংখ্যক সাহাবীকে মুরতাদ বলা। কিংবা তাদের সকলকে ফাসেক বলা। কিংবা জ্বীনজাতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করা।

খ. এমন কিছু বিষয়ের হারাম হওয়াকে মেনে না নেয়া, যে বিষয়গুলোর হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমা’ হয়েছে। যেমন, চুরি করা, মদ খাওয়া, যিনা করা, নারীদের জন্য বেপর্দা হয়ে বের হওয়া কিংবা নারী-পুরুষের অবাধ চলাফেরা করা ইত্যাদি। অথবা এই বিশ্বাস করা যে, কারো জন্য আল্লাহর শরীয়াহ ব্যতীত অন্য কোন বিচারব্যবস্থাকে বিচারক বানানো বা অন্য বিচারব্যবস্থায় বিচার চাওয়া বৈধ।

গ. এমন সব স্পষ্ট বৈধ বিষয়ের হালাল হওয়া মেনে না নেয়া, যেগুলো হালাল হওয়ার ব্যাপারে ইজমা’ আছে। যেমন গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু খাওয়া হালাল এই বিষয়টি কেউ অস্বীকার করল। কিংবা একাধিক স্ত্রী রাখা বা রুটি খাওয়া হালাল ইত্যাদি কোন বিষয় অস্বীকার করল।

ঘ. এমন কোন ফরজ বিধান অস্বীকার করা, যা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে অকাট্যভাবে ইজমা’ আছে। যেমন কেউ ইসলামের কোন একটি রোকন ফরজ হওয়া অস্বীকার করল। কিংবা ‘মৌলিকভাবে’ জিহাদ ফরজ হওয়া অস্বীকার করল অথবা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা ফরজ এই বিধান অস্বীকার করল।

- **সন্দেহ ও ধারণা করার কুফর**

একজন মুসলিমের জন্য দ্বীনের এমন কোন উসুলের প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দ্বিধা তৈরি হলো, যে উসুলের ব্যাপারে ইজমা’ হয়েছে। অথবা দ্বীন-ইসলামের এমন কোন সংবাদ বা বিধানের ব্যাপারে সে নিশ্চিত হতে

পারছে না, যা দ্বীনের অংশ বলে সুনিশ্চিতভাবে জ্ঞাত। কারণ ঈমান আনতে হলে অবশ্যই অন্তরের দৃঢ় সত্যায়ন থাকতে হবে। এমন সত্যায়ন, যেখানে সন্দেহ বা দ্বিধার কোন স্থান নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি তার ঈমান নিয়ে দ্বিধায় থাকবে সে মুসলিমই নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বাগান-মালিকের ঘটনা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন যে, ঐ ব্যক্তি কেবল এই দুইটি ধারণার কারণে কাফের হয়ে গেছে যে, তার বাগান মনে হয় কখনো ধ্বংস হবে না এবং কেয়ামত মনে হয় সংঘটিত হবে না। সে বলেছিল,

مَآ اَظُنُّ اَنۡ تَبِيۡدَ هٰذِهٖۤ اَبَدًا.

{আমি ধারণা করি, এটা কখনো ধ্বংস হবে না।} আল কাহফ- ৩৫। অর্থাৎ এখানে 'এটা' দ্বারা তার বাগান উদ্দেশ্য। সে আরো বলেছিল,

وَّ مَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً.

{আমি মনে করি না কেয়ামত কায়েম হবে।} আল কাহফ- ৩৬। তখন তার সাথে থাকা মু'মিন ব্যক্তিটি তাকে বলে উঠলেন,

اَكَفَرۡتَ بِالَّذِىۡ خَلَقَكَ مِنۡ تُرَابٍ ثُمَّ مِنۡ نُّطۡفَةٍ ثُمَّ سَوّٰٮكَ رَجُلًا.

{তুমি কি ঐ সত্তাকে অস্বীকার করলে যিনি তোমাকে মাটি থেকে তারপর বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন এরপর তোমাকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন পুরুষ আকৃতিতে?} আল কাহফ- ৩৭

এই প্রকারের আরো কিছু উদাহরণ, কোরআনের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ করা। কিংবা পুনরুত্থান ও মৃত্যুপরবর্তী জীবনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা। কিংবা জিবরিল আলাইহিস সালাম ফেরেশতা কিনা তা নিয়ে দ্বিধায় পড়া। মদ খাওয়া হারাম হওয়া নিয়ে সন্দেহ করা। ইহুদী-খৃষ্টানরা কাফের কিনা এ নিয়ে সন্দেহে পতিত হওয়া ইত্যাদি।

• প্রত্যাখ্যান ও অহংকার প্রদর্শনমূলক কুফর

এর অর্থ হলো, ইসলামের কোন উসুল ও আহকামকে অন্তর ও যবানের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেওয়ার পরেও, শুধু অহংকারবশতঃ ও নিজেকে বড় মনে করে কোন বিধান কর্মের মাধ্যমে পালন করতে অস্বীকৃতি জানানো। আহলুল ইলম এমন ব্যক্তির কুফরির ব্যাপারে একমত হয়েছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ আল্লাহর কোন একটি বিধান পালন করতে বিরত

থেকেছে। কারণ এতে করে আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা হয়। শুধু তাই নয়, এতে করে মহান আল্লাহর রুবুবিয়্যাহর দোষ ধরা হয় এবং কোরআন-সুন্নাহয় প্রমাণিত আল্লাহর হিকমাহ বা প্রজ্ঞা (الحكمة) সিফতকে অস্বীকার করা হয়।

এই প্রকার কুফরীর সবচেয়ে স্পষ্ট নজীর হলো, আল্লাহ তা'আলা ইবলিসকে আদেশ করেছিলেন, সে যেন আমাদের পিতা আদম আ.কে সেজদা করে। কিন্তু ইবলিস অহংকার করে ও নিজেকে এই আদেশ পালনের চেয়েও বড় মনে করে আল্লাহর হুকুম প্রত্যাখ্যান করে। তার আপত্তির কারণ ছিলো, সে নাকি আদম আ. এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এই আপত্তি মূলতঃ এই নির্দেশের পেছনে লুকায়িত আল্লাহর হিকমাহর ওপরই। নিজেকে বড় মনে করেই সে আল্লাহর হুকুম তামিল করতে অস্বীকৃতি জানায়।

এই প্রকার কুফরের আরেকটি উদাহরণ হলো, কোন ব্যক্তির জামাতে সালাত আদায় করতে অস্বীকৃতি জানানো এবং নিজেকে এই আমল থেকে এজন্য গুটিয়ে নেওয়া যে, জামাতের সাথে সালাত আদায় করার আমলটি এই লোক ও অন্যদের মাঝে সমতা বিধান করে। আরেকটি উদাহরণ হলো, যেমন কোন ব্যক্তি এহরামের কাপড় পরিধান করতে বিরত থাকলো এজন্য যে, তার দৃষ্টিতে এটি গরীবদের পোশাক আর এই পোশাক পরা তাকে মানায় না।

- **গালি দেওয়া ও উপহাস করার কুফর**

এর কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো- কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহকে নিয়ে উপহাস করা। আল্লাহর কোন নাম বা সিফত (গুণ) নিয়ে উপহাস করা। কোন ত্রুটিযুক্ত গুণ আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। আল্লাহকে গালি দেওয়া। তাঁর দ্বীনকে গালি দেওয়া। এ কথা বলা যে, 'এটা সেকেলে ধর্ম' কিংবা 'এই ধর্ম এই যুগের সাথে যায় না'। আল্লাহর সকল ফেরেশতা কিংবা অন্তত একজনকে নিয়ে হলেও উপহাস করা। যেমন মালাকুল মওতকে গালি দেওয়া। আল্লাহর কোন একটি কিতাবকে নিয়ে উপহাস করা কিংবা গালি দেওয়া। যেমন কোরআনকে গালি দেওয়া। কথা বা

কাজের মাধ্যমে কোরআন নিয়ে বা কোরআনের কোন একটি আয়াত নিয়ে উপহাস করা। কাজের মাধ্যমে উপহাস করার উদাহরণ হলো, যেমন কেউ ডাস্টবিন বা এজাতীয় কোন স্থানে কোরআন রাখল। কোন নবীকে গালি দেওয়া কিংবা তাকে নিয়ে উপহাস করা। কোরআন-সুন্নাহয় প্রমাণিত কোন ওয়াজিব বা সুন্নাহ নিয়ে উপহাস করা। যেমন সালাত, মেসওয়াক কিংবা লম্বা দাঁড়ি রাখা নিয়ে কেউ উপহাস করল। আহলুল ইলম এমন ব্যক্তির কাফের হওয়ার ব্যাপারে ইজমা করেছেন, যে আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের কোন অংশকে গালি দিয়েছে বা উপহাস করেছে। সেটা দুষ্টামির ছলে হোক, খেলাচ্ছলে হোক বা কোন কাফেরের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করতে গিয়ে হোক ইত্যাদি। ঝগড়ায় হোক, রাগের মাথায় হোক বা অন্য কোন পরিস্থিতিতে। কারণ আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে কাফের আখ্যা দিয়েছেন, যে আল্লাহকে নিয়ে, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসুল মুহাম্মাদ সা.কে নিয়ে উপহাস করেছে, যদিও তাদের বক্তব্য ছিলো যে, তারা এটা খেলাচ্ছলে করেছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَ نَلْعَبُ ط قُلْ اَ بِاللّٰهِ وَ اٰيٰتِه وَ رَسُوْلِه كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ. لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ط اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ.

{আর আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করলে অবশ্যই তারা বলবে, আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বলুন, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসুলকে বিদ্রুপ করছিলে? তোমরা ওজর পেশ করোনা তোমরা তো ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গিয়েছো। আমি তোমাদের মধ্যে কোন দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেব, কারণ তারা অপরাধী।} আত তাওবাহ- ৬৫, ৬৬। যারা এভাবে উপহাস করছে তারা মূলতঃ আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ, উলুহিয়্যাহ ও তাঁর রিসালাতকে হালকাভাবে দেখছে। এতে করে তারা আল্লাহ তা'আলার পুরো দ্বীনকেই হালকাভাবে দেখছে। এসবকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। আর এই কাজটিই মূলত ঈমান ও ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

• ঘৃণা ও অপছন্দ করার কুফর

অর্থাৎ আল্লাহ তা’আলার দ্বীনের কোন একটি বিষয়কে ঘৃণা বা অপছন্দ করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন,

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمۡ كَرِهُوۡا مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ فَاَحۡبَطَ اَعۡمَالَهُمۡ.

{এটা এজন্যে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করেছে। কাজেই তিনি তাদের আমলসমূহ বাতিল করে দিয়েছেন।} মুহাম্মাদ- ০৯। যেমন কোন ব্যক্তি সালাত আদায় করা, হিজাব পরিধান করা, হুদুদ কায়েম করা বা সুন্নাহর অনুসরণ করাকে অপছন্দ করল।

দ্বীনের কোন কিছুকে অপছন্দ করার দুইটি সুরত-

১। এমন বিধান কেন দেওয়া হলো এই দৃষ্টিকোণ থেকে অপছন্দ করা। এটা কুফর।

২। এমন বিধান কেন দেওয়া হলো এই দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং এজন্য অপছন্দ করা যে, এই আমল তার জন্য করা কষ্টকর। কিন্তু সে মুখে ঠিকই আমলটির স্বীকৃতি দিচ্ছে এবং সে জানেও যে, এটি হক্ব। যেমন আল্লাহ তা’আলা বলেন,

كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الۡقِتَالُ وَ هُوَ كُرۡهٌ لَّكُمۡ.

{তোমাদের ওপর লড়াই করা ফরজ করা হয়েছে অথচ তা তোমাদের নিকট অপছন্দ।} আল বাকারা- ২১৬। অর্থাৎ জিহাদ ঐ ব্যক্তির নিকট এজন্য অপছন্দ যে, এতে রয়েছে তার জানের ক্ষতি। এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হবে ঐ ব্যক্তিও, যে কৃপণতাবশতঃ যাকাতের মাল বের করতে অপছন্দ করে। এই কারণে নয় যে, যাকাতের বিধান কেন দেওয়া হলো। সুতরাং তার কাজটি কুফর নয়। আরেকটি উদাহরণ হলো, যে স্ত্রী অপছন্দ করে যে, তার স্বামী তার উপস্থিতিতেই আরেকটি বিবাহ করবে। এই নারীও কাফের হবে না।

• উপেক্ষা করার কুফর

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনকে উপেক্ষা করে। সে দ্বীন শেখে না, দ্বীনের ওপর আমলও করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ط اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ.

{ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে যাকে তার রবের আয়াতসমূহ দ্বারা নাসিহা করা হয়, কিন্তু সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? নিশ্চই আমি অপরাধীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।} আস সাজদাহ- ২২। এখানে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কোন ব্যক্তি দ্বীন সম্পর্কে ইলম হাসিল করে না এবং দ্বীনের ওপর কোন আমলই করে না, ফলে সম্পূর্ণ দ্বীন থেকেই সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অথবা যে ব্যক্তি আসলুদ দ্বীন[১] থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিংবা যে ব্যক্তি এমন আমল থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেই আমলটি ত্যাগ করা কুফর। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এক দুইটি ওয়াজিব আমল থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার এই মুখ ফিরিয়ে নেয়া কুফর বলে গণ্য হবে না। কারণ এক দুইটি ওয়াজিব আমল না করা সার্বিকভাবে দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার মধ্যে পড়ে না।

• কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করার কুফর

মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং তাদেরকে সহযোগিতা করা কুফর। এ ব্যাপারে দলীল হলো, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَ النَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ط وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

{হে ঐ সকল লোক যারা ঈমান এনেছো, তোমরা ইহুদী-খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ জালেমদেরকে হেদায়াত দান করেন না} আল মায়িদা- ৫১

---

[১] আসলুদ দ্বীন হলো, আল্লাহকে স্বীকার করা, একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলারই ইবাদাত করা, আল্লাহ ব্যতীত আর যা কিছু আছে এমন সব কিছুর ইবাদাত বর্জন করা এবং মুশরিকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

আল ওয়ালা ওয়াল বারা এর মাসআলা-

মনে রাখবেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মু'মিনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা (আল ওয়ালা) ওয়াজিব করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি গুরুত্বারোপ করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি মুশরিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা হারাম করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি কঠোরতা করেছেন। এমনকি তাওহীদ আর শিরকের পর কোরআনে এই বিধান ব্যতীত অন্য কোন বিধানের ব্যাপারে এতো বেশি সংখ্যক ও স্পষ্ট দলীল পাওয়া যায় না।

মু'মিনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা ওয়াজিব হওয়া মর্মে সবচেয়ে স্পষ্ট দলীল হলো আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَه ط اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

{আর মু'মিন পুরুষগণ ও মু'মিন নারীগণ একে অপরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করে। তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে। তাদেরকেই আল্লাহ অবশ্যই দয়া করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ চির পরাক্রমশালী, চির প্রজ্ঞাবান।} আত তাওবাহ- ৭১। পক্ষান্তরে কাফেরদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা

ওয়াজিব এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা হারাম এই মর্মে স্পষ্ট দলীল হলো, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَ الَّذِيْنَ مَعَه ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۫ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَه اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ مَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ط رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ اِلَيْكَ اَنَبْنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

{ইবরাহীম এবং তাঁর সঙ্গে যারা আছে অবশ্যই তাদের মাঝে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ, যখন তারা নিজ সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, নিশ্চই আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যা কিছুর ইবাদাত করো তা থেকে মুক্ত। আমরা তোমাদেরকে

অস্বীকার করলাম এবং তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আগ পর্যন্ত চিরকালের জন্য তোমাদের আর আমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়ে গেলো। তবে ইবরাহীমের পিতাকে উদ্দেশ্য করে বলা তাঁর এই কথা ব্যতীত (অর্থাৎ আদর্শ নয়) যে, অবশ্যই আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো। তবে আমি তোমার জন্য আল্লাহর কাছে কোন কিছুরই অধিকার রাখি না। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ওপর নির্ভর করেছি, আপনারই অভিমুখী হয়েছি এবং ফিরে যাওয়া তো আপনারই কাছে।} আল মুমতাহিনাহ- ০৪

মু'মিনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা ওয়াজিব আর কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা হারাম এ ব্যাপারে আহলুল ইলম ইজমা' করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ج وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَىْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً ط وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَه ط وَ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ.

{মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ছাড়া কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। আর যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্কে থাকবে না; তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট থেকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন এবং আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন।} আলে ইমরান- ২৮

ইমাম তবারী রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, 'এর অর্থ হলো, তোমরা কাফেরদেরকে পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করো না। অর্থাৎ এভাবে যে, তাদের ধর্ম ভিন্ন হওয়া সত্বেও তোমরা তাদেরকে বন্ধু বানাবে। মু'মিনদেরকে ছেড়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করবে এবং মুসলিমদের যাবতীয় গোপন বিষয় তাদেরকে দেখিয়ে দিবে। সুতরাং এগুলো যদি কেউ করে তাহলে فليس من الله في شيء **{তার সাথে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্কে থাকবে না}** অর্থাৎ সে আল্লাহ থেকে মুক্ত এবং আল্লাহও তার থেকে মুক্ত, কারণ সে মুরতাদ হয়ে গেছে এবং কুফরের গণ্ডিতে প্রবেশ করেছে।' জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল বাজালী রা. এর হাদীসে আছে, তিনি যখন রাসুলের নিকট ইসলামের বায়াহ গ্রহণ করতে এলেন তখন তিনি রাসুলকে বললেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، ابْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ، وَاشْتَرِطْ عَلَيَّ، فَأَنْتَ أَعْلَمُ، قَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللهَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتُنَاصِحَ الْمُسْلِمِينَ، وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ.

"ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আপনার হাত প্রসারিত করুন যেন আমি বায়াহ দিতে পারি এবং আপনি (বায়াহ প্রদানের ক্ষেত্রে) শর্তারোপ করুন, কারণ এ ব্যাপারে আপনিই ভালো জানেন। তখন রাসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি এই শর্তে তোমার বায়াহ গ্রহণ করছি যে, তুমি আল্লাহর ইবাদাত করবে, সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং মুসলিমদের কল্যাণকামী হবে আর মুশরিকদেরকে পরিত্যাগ করবে।" নাসায়ী[১]- ৪১৭৭

• যাদু করা সংক্রান্ত কুফর

যাদুর একটি কাজ হলো, কাউকে বিমুখী করা এবং কাউকে বশে আনা। যে ব্যক্তি এগুলো করবে কিংবা এসব কাজে খুশী থাকবে সে কাফের হয়ে যাবে। দলীল হলো আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ مَا يُعَلِّمٰنِ مِنۡ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوۡلَاۤ اِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٌ فَلَا تَكۡفُرۡ.

{তারা ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে (যাদু) শেখাত না যতক্ষণ না তারা বলত যে, আমরা পরীক্ষার বিষয়, সুতরাং তুমি কুফরী করো না।} আল বাকারা-১০২। কাউকে বিমুখী করার অর্থ হলো, এই উদ্দেশ্যে বিশেষ যাদু করা যাতে করে প্রিয়জন বিরাগভাজনে পরিণত হয়। আর বশে আনার অর্থ হলো, এই উদ্দেশ্যে যাদু করা যাতে করে বিরাগভাজন প্রিয়জনে পরিণত হয়। যেমন স্বামী বা অন্য কাউকে এমন যাদু করা।

মাসআলা- যাদুকরদের নিকট যাওয়ার হুকুম। নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

"যে ব্যক্তি জ্যোতিষী বা গণকের কাছে আসবে এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করবে সে যেন ঐ জিনিস অস্বীকার করলো যা মুহাম্মাদের ওপর নাযিল

---

[১] মুহাক্কিক হাদীসটির ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন যে, এটি একটি সহীহ হাদীস। প্রকা. দারুর রিসালাহ।

করা হয়েছে।” মুসনাদে আহমাদ[১]- ৯৫৩৬। নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

“যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর কাছে এসে তার কাছে কোন কিছু জানতে চাইবে তার সালাত ৪০ দিন কবুল হবে না[২]।” সহীহ মুসলিম- ২২৩০

মাসআলা- যাদুর মাধ্যমে যাদু কাটা (অর্থাৎ নাশরাহ النشرة) এর হুকুম যাদু করার মতোই।

- **যে ব্যক্তি মুশরিকদেরকে কাফের মনে করবে না কিংবা তাদের কুফরের ব্যাপারে সন্দেহ করবে কিংবা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করবে সে কাফের হয়ে যাবে।**

ইসলাম ভঙ্গকারী এই কারণটির ব্যাপারে সমষ্টিগতভাবে (এজমালীভাবে) আলেমগণ ইজমা’ করেছেন। এই কারণটির ভিত্তি একটি মূলনীতির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে এবং কোরআনের দলীল ও মুসলিমদের ইজমা’র ওপর এটি প্রতিষ্ঠিত আছে। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَ مَا يَجۡحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا الۡكٰفِرُوۡنَ.

{আমার আয়াতসমূহকে কেবল কাফেররাই অস্বীকার করে।} আল আনকাবুত- ৪৭। তিনি আরো বলেন,

فَمَنۡ اَظۡلَمُ مِمَّنۡ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَ كَذَّبَ بِالصِّدۡقِ اِذۡ جَآءَهٗ ؕ اَلَیۡسَ فِیۡ جَهَنَّمَ مَثۡوًی لِّلۡكٰفِرِیۡنَ.

{সুতরাং ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে এবং তার নিকট যখন সত্য সমাগত হয় তখন সে ঐ সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? জাহান্নামে কি কাফেরদের আশ্রয়স্থল নেই?} আয যুমার- ৩২। এছাড়াও শরীয়াহর আরো অনেক দলীল রয়েছে,

---

[১] মুহাক্কিক হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। প্রকা. দারুর রিসালাহ।

[২] হাদীসে দেখা যাচ্ছে জ্যোতিষী বা গণকের কাছে যাওয়ার প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে; যাদুকরের কথা নয়। তা সত্বেও এই হাদীসটি আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে দলীল এভাবে যে, জ্যোতিষী বা যাদুকর এরা সবাই জ্বীন শয়তানের সাহায্যে কাজ করে থাকে। আর এভাবে জ্বীন শয়তানের সাহায্য গ্রহণ করা শিরক। যেহেতু যাদুকরের কাজের পদ্ধতিও একই সেহেতু এক্ষেত্রে জ্যোতিষী সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা’আলাই ভালো জানেন।

যা এমন ব্যক্তির কাফের হওয়ার প্রমাণ বহন করে, যে শরীয়াহর মধ্যে প্রমাণিত কোন সংবাদ বা বিধানকে মিথ্যা মনে করে। যেহেতু কোন কিছুকে মিথ্যা মনে করা ও অস্বীকার করা ঐ জিনিসটিকে জানা ও স্বীকার করার পরই হয়ে থাকে সেহেতু ইসলাম ভঙ্গকারী এই কারণটি নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে প্রয়োগ হয়-

যে ব্যক্তি এমন কোন কাফেরকে কাফের মনে করল না, যার কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোরআনের অকাট্য দলীল ঐ ব্যক্তির নিকট পৌঁছেছে অথবা ঐ কাফেরের কাফের হওয়া মর্মে রসুলুল্লাহ সা. এর কোন অকাট্য হাদীস তাঁর নিকট প্রমাণিত আছে, পাশাপাশি ঐ ব্যক্তিকে তাকফীর করার সমস্ত শর্ত পাওয়া যাচ্ছে এবং তাকে তাকফীরের কোন প্রতিবন্ধকতাও তার মাঝে নেই তাহলে এমতাবস্থায় এই ব্যক্তি যেন কোরআন ও সুন্নাহর দলীলকেই মিথ্যা মনে করল। আর যে কোরআন-সুন্নাহর কোন দলীলকে মিথ্যা মনে করবে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের হয়ে যাবে।

এই ব্যাপারটি আরেকটু পরিষ্কার করা যাক। এই যে বলা হলো, 'যে ব্যক্তি মুশরিকদেরকে কাফের মনে করবে না' এটির কয়েকটি সুরত রয়েছে-

১। যদি কেউ এমন কাউকে তাকফীর না করে যার কাফের হওয়া মর্মে সুনির্দিষ্টভাবে ওহী এসেছে তাহলে এই ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। যেমন কেউ ইবলিস, ফেরাউন, হামান, আবু জাহল, আবু তালেব বা এ জাতীয় কাউকে কাফের মনে করল না তাহলে এই ব্যক্তিও কাফের হয়ে যাবে। কেননা এই ব্যক্তি ওহীকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। আল্লাহ যার অন্তর্দৃষ্টিকে মুছে দিয়েছেন একমাত্র এমন ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ এই বিষয়ে এখতেলাফ করেনি। কারণ এই ব্যক্তি তো মূলতঃ আল্লাহর বিপরীত একটি সিদ্ধান্ত দিচ্ছে এবং আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর আঙ্গুল তুলছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ اللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ط وَ هُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.

{আর আল্লাহই আদেশ করেন, তাঁর আদেশের সমালোচনা করার কেউ নেই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর।} আর রা'দ- ৪১। সে তো আল্লাহর প্রদানকৃত একটি সংবাদকেই অস্বীকার করল।

২। যে ব্যক্তি আসলী কাফেরকে কাফের মনে করে না, যেমন- ইহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক বা এজাতীয় কেউ তাহলে সেও কাফের হয়ে যাবে। কাজী ইয়াজ রহ. তার কিতাব 'আশ শিফা'তে উল্লেখ করেছেন,

ولهذا نكفّر من لا يكفّر من دان بغير ملة الإسلام من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم.

'এ কারণেই যে ব্যক্তি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিকে কাফের মনে করে না কিংবা তাদের ব্যাপারে চুপ থাকে বা সন্দেহ করে কিংবা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করে এমন ব্যক্তিকে আমরা কাফের মনে করি।' আশ শিফা- ২/২৮৬ প্রকা. দারুল ফিকর।

৩। কেউ যদি এমন বিশেষ ব্যক্তিকে তাকফীর না করে যার কাফের হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ একমত হয়েছেন তাহলে সেও কাফের।

৪। যে ব্যক্তির নিকট কোন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির কুফরী শরীয়াহর যাবতীয় দলীল দ্বারা স্পষ্ট হওয়ার পরও ঐ ব্যক্তিকে সে তাকফীর করল না তাহলে সেও কাফের হয়ে যাবে। মরক্কোর শায়খ আল বাশীর ইসাম বলেন,

ورغم ما قلت من التحذير + لا ينبغي الوقوف في التكفير

إذا بدا الكفر جليا وظهر + من لم يكفر كافرا فقد كفر.

'তাকফীরের ব্যাপারে যে সতর্কতার কথা বললাম তা সত্বেও/তাকফীর করতে পিছপা হওয়া যাবে না_

যদি কুফরটি হয় স্পষ্ট ও প্রকাশ্য/কারণ, যে কাফেরকে কাফের মনে করে না সেও কাফের হয়ে যায়[১]।'

উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা স্পষ্ট যে, ইসলাম ভঙ্গের এই কারণটি স্পষ্ট কুফরে লিপ্ত কাফেরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন ইহুদী-খৃষ্টান বা তাদের মতো কেউ। অর্থাৎ এই শ্রেণীর কাফেরদেরকে তাকফীর করা থেকে বিরত থাকা ব্যক্তি মূলত শরীয়াহর অকাট্য দলীলকেই মিথ্যা মনে করছে। আর যে ব্যক্তির অবস্থা এমন সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মতভেদপূর্ণ ইসলাম ভঙ্গকারী কোন কারণে লিপ্ত হয়েছে, তাকে তাকফীর

---

[১] শারহু মানযুমাতিল ঈমান পৃ. ১৩। প্রকা. মাতবা'আতুন নাজাহ আল জাদীদাহ।

না করার কারণে কাউকে তাকফীর করা যাবে না। যেমন, সালাত পরিত্যাগ করা।

মাসআলা- ওপরে উল্লিখিত মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে যদি কোন অজ্ঞ মুসলিম তাকফীর না করে তাহলে তার সামনে দলীল পেশ করা ব্যতীত (হুজ্জাহ কায়েম) তাকে কাফের বলা যাবে না। দলীল পেশ করা বা হুজ্জাহ কায়েম দুই ভাবে হয়ে থাকে-

১। ঐ সমস্ত কাফের শ্রেণীর কুফরী কথা-বার্তা তাকে (অজ্ঞ মুসলিমকে) জানানো হবে যদি তিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন।

২। ঐ কুফরী কথা-বার্তাগুলো ইসলামের সঙ্গে কীভাবে সাংঘর্ষিক হলো তা তাকে জানানো হবে যদি তিনি এটিও না জেনে থাকেন। আহলুল ইলমের নিকট এই মূলনীতিটি মুতলাক অবস্থায় কোরআন-সুন্নাহর ভীতিপ্রদর্শনমূলক বক্তব্য-র মতোই। অর্থাৎ যখন বিভিন্ন ফের্কা, মতাদর্শ ও ভ্রান্ত মাসলাক নিয়ে আলোচনা হয় তখন আহলুল ইলম এই মূলনীতিটি, এভাবেই ব্যবহার করেন। কিন্তু যখনই এটি কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার প্রশ্ন আসবে তখনই দেখতে হবে যে, তাকফীর করার শর্ত পাওয়া যাচ্ছে কিনা এবং তাকফীরের প্রতিবন্ধকতা দূর হয়েছে কি না।

দ্বিতীয় প্রকার- কুফরে আসগর বা ছোট কুফর।

এটি কুফরের আরেকটি প্রকার।

কুফরে আসগর বা ছোট কুফরের সংজ্ঞা- যেসমস্ত ব্যাপারকে কোরআন-সুন্নাহয় কুফর বলা হয়েছে, কিন্তু অপর একটি দলীলের মাধ্যমে এও প্রমাণিত যে, এই ব্যাপারগুলো একজন ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে খারেজ করে দেয় না। যেমন স্বামীর সাথে কুফরী (অকৃতজ্ঞতা) করা। রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন,

أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ. قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

"আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়েছে। আমি দেখলাম জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী নারী, যারা কুফরী করে।" বলা হলো, তারা কি আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করে? তিনি বললেন, "তারা স্বামীর সাথে কুফরী (অকৃতজ্ঞতা) করে। স্বামীর ইহসানের প্রতি কুফরী (অকৃতজ্ঞতা) করে। তুমি যদি একজন স্ত্রীর প্রতি সারাটা জীবন ইহসান করো তারপর সে তোমার মাঝে কোন খারাপ কিছু দেখে তাহলে সে বলে উঠবে, আমি আপনার মাঝে কখনো ভালো কিছু দেখিনি।" সহীহ বুখারী- ২৯।

কুফরে আসগরের আরো কিছু উদাহরণ- কারো বংশের নিন্দা করা। মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা।

নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ.

"মানুষের মাঝে দুইটি কুফরী স্বভাব রয়েছে, (আর তা হলো,) কারো বংশের নিন্দা করা আর মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা।" সহীহ মুসলিম- ১২১

জরুরী জ্ঞাতব্য- মুরজিয়ারা এই বিশ্বাস করে যে, কুফর কেবল অন্তর থেকেই হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি কোন কুফরী কাজ বা কথা বলেছে, সে মন থেকে কুফর করার আক্বীদা না রাখা পর্যন্ত কাফের হবে না। তাদের মধ্যে কেউ এমন আক্বীদাও রাখে যে, কুফরী কথা বা কুফরী কাজ বলতে কিছু নেই। বরং ব্যক্তির কথা বা কাজ তার মাঝে থাকা বিদ্যমান কুফরের প্রমাণ বহন করে। অর্থাৎ শুধু কথা বা কাজ মূলত কুফরী নয়। অথচ এটা সুস্পষ্ট গোমরাহী।

ইমাম বারবাহারী রহ. (শারহুস সুন্নাহয়) বলেন,

ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله، فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة.

'আমরা আমাদের কিবলার অনুসারী কোন মুসলিমকে ইসলাম থেকে খারেজ মনি করি না যতক্ষণ না সে আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতকে

প্রত্যাখ্যান করে, কিংবা রসুলুল্লাহ সা. এর কোন হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করে, কিংবা গাইরুল্লাহর জন্য যবেহ করে বা গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে। তো কোন মুসলিম যদি এগুলোর কোন একটি কাজ করে তখন আপনার ওপর আবশ্যক হলো, তাকে ইসলাম থেকে খারেজ মনে করা। কিন্তু সে যদি এই কাজগুলো না করে তাহলে তার নাম মু'মিন ও মুসলিম হবে ঠিকই কিন্তু বাস্তবে নয়[১]। শারহুস সুন্নাহ[২]- পৃ. **১৩**

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন,

إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل.

'আল্লাহকে গালি দেওয়া কিংবা তাঁর রাসুলকে গালি দেওয়া বাহ্যিক ও ভেতরগত উভয় দিক থেকেই কুফরী। চাই গালিদাতা ব্যক্তি গালি দেওয়ার সময়ে এই কাজকে হারাম মনে করে থাকুক বা এমন কোন কিছু তার মনে না থাকুক। এটিই হলো ফুকাহায় কেরাম ও আহলুস সুন্নাহর মাজহাব, যারা বলেন, ঈমান হলো কথা ও কাজের নাম।' আস সরিমুল মাসলুল[৩]- ৫১২ পৃ.

হতে পারে সে দ্বীন ত্যাগ করে মুসলিমদের জামা'আহ থেকে পৃথক হয়ে যাবে আবার পাশাপাশি সে কালেমার সাক্ষ্য দিয়ে নিজেকে মুসলিমও দাবি করবে। যেমন, এটাও হতে পারে যে, সে জেনেবুঝে ইসলামের কোন রোকন অস্বীকার করল, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে গালি দিলো, কোন ফেরেশতা, নবী বা কোরআনে উল্লিখিত কোন আসমানী কিতাবকে অস্বীকার করল।

---

[১] অর্থাৎ যতক্ষণ না সে ফরজ আমলগুলো আদায় করছে এবং হারাম কাজগুলো থেকে বিরত থাকছে ততক্ষণ সে প্রকৃত মু'মিন হবে না।

[২] প্রকা. মাকতাবাতুল ইমাম আল ওয়াদিয়ী, দারু ওমর ইবনুল খাত্তাব।

[৩] প্রকা. আল হুররাসুল ওয়াতানিয়্যুস সু'উদী।

ইসলাম ভঙ্গকারী কারণ ৩-বড় নেফাক (নেফাকে ই'তেকাদী বা বিশ্বাসগত)

বড় নেফাকের সংজ্ঞা- একজন মানুষ যখন বাহ্যদৃষ্টিতে আল্লাহর প্রতি ঈমান, ফেরেশতাগণ, সমস্ত আসমানী কিতাব, সকল রাসুল, শেষ দিবস ও তাকদীরের প্রতি ঈমান আনে কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে এগুলোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোন কিছু পোষণ করে তখন সেটাকে বড় নেফাক বা নেফাকে ই'তেকাদী বলা হয়।

নিম্নে মুনাফেকদের কিছু আলামত উল্লেখ করা হলো-

১- তারা কম ইবাদাত করে এবং ফরজ ইবাদাতগুলো করার ক্ষেত্রে অলসতা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَ اِذَا قَامُوْۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا.

{নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করে। বস্তুতঃ তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেন। আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন অলসতা করে দাঁড়ায়, শুধু লোক দেখানোর জন্য। আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে।} আন নিসা- ১৪২

২- তাদের মাঝে কাপুরুষতা ও প্রচণ্ড ভয় বিদ্যমান থাকে। তারা যে ভেতরে ভেতরে কুফরী গোপন রেখে ওপরে ওপরে নিজেকে মুসলিম পরিচয় দেয় এটার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটিই। কারণ তারা এই ভয়ে থাকে যে, তাদের কুফরী প্রকাশ পেয়ে গেলে তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং তাদের ধন-সম্পদ নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের এতোটুকু সাহস নেই যে, তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। একারণেই তারা নেফাকীর আশ্রয় গ্রহণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ اِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ؕ وَ اِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ؕ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ؕ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ؕ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۫ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ.

{আপনি যখন তাদের দিকে তাকাবেন, তখন তাদের দেহাকৃতি আপনাকে মুগ্ধ করবে। তারা যখন কথা বলে, তখন আপনি সাগ্রহে তা শুনে থাকেন;

তারা যেন দেওয়ালে ঠেকানো কাঠের খুঁটি। তারা যেকোন শোরগোলকে মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হন, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে?} আল মুনাফিকুন- ০৪। তো তাদের এই অত্যাধিক ভীতির কারণেই তারা কোন চিৎকার শুনলেই মনে করে এটা তাদের শত্রুর পক্ষ থেকে কোন সতর্ককারীর চিৎকার, যারা আক্রমণ করতে চলে এসেছে। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা আরো বলেন,

وَ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ط وَ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَ لٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ. لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَ هُمْ يَجْمَحُوْنَ.

{আর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বস্তুত তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা ভয় করে থাকে। তারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গিরিগুহা অথবা লুকিয়ে থাকার কোন প্রবেশস্থল পেলে সেদিকেই পালিয়ে যাবে দ্রুততার সাথে।} আত তাওবাহ- ৫৬-৫৭। তো তাদের বৈশিষ্ট্য হলো এমন চরম ভীতি। এ কারণে যুদ্ধের সময়ে তাদের কেউ যদি কোন দূর্গ, পাহাড়ের গুহা বা কোন সুড়ঙ্গ পেয়ে যায়, যেখানে গিয়ে লুকানো যাবে তাহলে সে দ্রুত সেদিকে ছুটে যায়।

৩- বোকামি, দুর্বল চিন্তাশক্তি ও স্বল্প বুদ্ধি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَاۤ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ كَمَاۤ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ط اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَ لٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ.

{তাদেরকে যখন বলা হয় 'তোমরা ঈমান আনো যেমন লোকেরা ঈমান এনেছে' তখন তারা বলে, আমরা কি ঈমান আনবো যেমন নির্বোধেরা ঈমান এনেছে? শুনে রাখো! নিঃসন্দেহে তারাই হলো নির্বোধ, কিন্তু তারা তা জানে না।} আল বাকারা- **১৩**

তাদের নির্বুদ্ধিতার কিছু উদাহরণ-

ক. আখেরাতকে বাদ দিয়ে তারা এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আল্লাহর আনুগত্য করার ব্যাপারে তাদের কোন আগ্রহ নেই। তাদের যত আগ্রহ দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদের প্রতি। অথচ আল্লাহর আনুগত্যই

তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সুখের কারণ ছিলো। যেসমস্ত মুনাফেক জামাতের সাথে সালাতে অংশগ্রহণ করে না তাদের ব্যাপারে নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لو يعلَمُ أحدُهم أنَّه يجِدُ عظمًا سمِينًا أو مِرْماتينِ حسَنتَيْنِ لشهِد العِشاءَ.

"যদি তাদের কেউ জানত যে, সে একটি মাংসহীন মোটা হাঁড় বা ছাগলের ভালো দুটি পা পাবে তাহলে অবশ্যই সে এশার জামা'আতেও হাজির হতো।" মুয়াত্তা মালেক[১]- ৪২৭। তারা এমন জিনিস থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে যার মাঝে তাদের নাজাত নিহিত।

খ. তাদের অধিকাংশ লোক মন থেকেই বিশ্বাস করে যে, দ্বীন ইসলাম সত্য ধর্ম এবং ইসলামের বিধি-বিধানই উত্তম ও ইনসাফপূর্ণ। কিন্তু তারা কাফেরদের সঙ্গে উঠাবসা করে। পশ্চিমা জড় সভ্যতা দেখে মুগ্ধ হয়। কিংবা যেসমস্ত মুনাফেক, সেক্যুলার, আধুনিকতাবাদী ও জাতীয়তাবাদী কাফেরদের সভ্যতায় মুগ্ধ হয় তাদের সাথে তারা উঠাবসা করে। শুধু তাই নয়, এই মুনাফেকরা তাদের কথা শ্রবণ করে এবং দ্বীন-ইসলামের শিক্ষাকে কেন্দ্র করে তারা যেসমস্ত সংশয় মানুষের মাঝে উস্কে দেয় সেগুলোও তারা শ্রবণ করে। এসব কিছুর ফলশ্রুতিতে তাদের অন্তরে এই দ্বীনের বিরুদ্ধে ঘৃণা তৈরি হয়। তারা কাফেরদের অনুসরণ করতে, তাদের বানানো আইন প্রতিষ্ঠা করতে, আল্লাহর শরীয়াহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে এবং এই শরীয়াহর সমালোচনা করতে মানুষকে আহ্বান করতে শুরু করে। অথচ এটাই হলো চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা। কারণ একজন ব্যক্তি কীভাবে এমন কিছুর সমালোচনা করতে পারে এবং কীভাবে এমন কিছুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে যেই জিনিসটির ব্যাপারে সে জানে যে, তা হক্ব?

গ. তাদের লজ্জা কম এবং তাদের জবান খুব ক্ষুরধার। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَدۡ يَعۡلَمُ اللّٰهُ الۡمُعَوِّقِيۡنَ مِنۡكُمۡ وَ الۡقَآئِلِيۡنَ لِاِخۡوَانِهِمۡ هَلُمَّ اِلَيۡنَا ۚ وَ لَا يَاۡتُوۡنَ الۡبَاۡسَ اِلَّا قَلِيۡلًا.

اَشِحَّةً عَلَيۡكُمۡ ۚۖ فَاِذَا جَآءَ الۡخَوۡفُ رَاَيۡتَهُمۡ يَنۡظُرُوۡنَ اِلَيۡكَ تَدُوۡرُ اَعۡيُنُهُمۡ كَالَّذِيۡ يُغۡشٰى عَلَيۡهِ

[১] প্রকা. মুয়াসসাসাতু যায়েদ।

مِنَ الْمَوْتِ ج فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ط أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ط وَ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا.

{আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা বাধাদানকারী এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের দিকে চলে এসো। তারা অল্পই যুদ্ধে যোগদান করে— তোমাদের ব্যাপারে কৃপণতাবশতঃ। অতঃপর যখন ভয় আসে তখন আপনি দেখবেন, মৃত্যুভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির মত চোখ উল্টিয়ে তারা আপনার দিকে তাকায়। কিন্তু যখন ভয় চলে যায় তখন তারা ধনের লালসায় তোমাদেরকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে। তারা ঈমান আনেনি ফলে আল্লাহ তাদের কাজকর্ম নিস্ফল করেছেন এবং এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।} আল আহযাব- **১৮, ১৯**

জরুরী জ্ঞাতব্য- নেফাকে আসগর বলা হয় আমলী নেফাককে। নেফাকে আসগর যার মাঝে পাওয়া যায় ঐ ব্যক্তি দ্বীন থেকে বের হয়ে যায় না। কিন্তু সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্য বলে বিবেচিত হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত যে, নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

"চারটি স্বভাব যার মাঝে থাকবে সে খাঁটি মুনাফেক বলে গণ্য হবে। যার মাঝে ঐ চারটি স্বভাবের কোন একটি থাকবে তার মাঝে একটি মুনাফেকী স্বভাব থাকবে বলে গণ্য হবে, যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করছে। (স্বভাবগুলো হলো) যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় তখন সে আমানতের খেয়ানত করে। যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে। যখন সে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তখন সে তা ভঙ্গ করে। যখন ঝগড়ায় লিপ্ত হয় তখন গালিগালাজ করে।" সহীহ বুখারী- ৩৪

যেহেতু ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়গুলোর আলোচনা আমরা শেষ করলাম সেহেতু এখন একটি জরুরী কথা হলো, রসিকতা করে হোক, সিরিয়াসলি হোক কিংবা ভয়ের কারণে হোক সব ক্ষেত্রেই এই কারণগুলো সমানভাবে

প্রযোজ্য, একমাত্র ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাকে এসব ব্যাপারে বাধ্য করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِه اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُه مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَ لٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

{কেউ তার ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার ওপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয়, কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত।} আন নাহল- ১০৬

বাধ্য বিবেচিত হওয়া বা ইকরাহের কিছু গ্রহণযোগ্য শর্ত-

- অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ থাকতে হবে। (এবং যেই ব্যাপারে বাধ্য করা হচ্ছে তা ঘৃণা করতে হবে)
- ইকরাহ বা বাধ্য করার বিষয়টি বাস্তবসম্মত হওয়া জরুরী। যেমন, প্রহার করা, বন্দী করা, ক্ষুধার্ত রাখা ও এজাতীয় কিছু।
- যে ব্যাপারে বাধ্য করা হচ্ছে তা অন্যকেও আক্রান্ত করবে এমন না হওয়া। যেমন কাউকে হত্যা করতে বলা হলো, বা যিনা করতে বলা হলো কিংবা এ জাতীয় কিছু।
- যে বাধ্য করবে সে আসলেই বাধ্য করতে সক্ষম হওয়া।

এখন প্রশ্ন হলো, ইসলাম ভঙ্গকারী ঐ কারণগুলো কী কী যেগুলোতে পতিত ব্যক্তির জন্য অজ্ঞতার ওজুহাত গ্রহণযোগ্য এবং যেগুলোতে গ্রহণযোগ্য নয়?

ওজর বিল জাহল বা অজ্ঞতার ওজুহাত

এই মাসআলাটির কয়েকটি হুকুম রয়েছে-

প্রথমতঃ যে ক্ষেত্রে অজ্ঞতার ওজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। আর তা হলো, আসলুদ দ্বীন বা দ্বীনের মৌলিক বিষয়। অর্থাৎ যদি এমন কিছু করা হয় যার কারণে কালিমায় শাহাদাহর সামষ্টিক (এজমালী إجمالي) অর্থই ভেঙ্গে পড়ে তাহলে এক্ষেত্রে অজ্ঞতার ওজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন, গাইরুল্লাহর জন্য খালেস কোন ইবাদাত করা কিংবা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বা রাসুল সা. এর সমালোচনা করা। অর্থাৎ শুধু কালিমায় শাহাদাহ বোঝার দ্বারাই যে মাসআলায় একজন ব্যক্তির নিকট দলীল উপস্থাপন হয়ে যায় সেই মাসআলায় ঐ ব্যক্তির অজ্ঞতার ওজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না, যদিও সে ইলমী পরিবেশ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে কিংবা নও মুসলিম হয়। কারণ এক্ষেত্রে কালিমায় শাহাদাহ বোঝার দ্বারাই তার সামনে দলীল উপস্থাপিত (হুজ্জাহ কায়েম) হয়ে যায়। সুতরাং এমন ব্যক্তির দুইটি অবস্থার যেকোন একটি অবস্থা হবে। হয় সে ব্যক্তি কালিমায় শাহাদাহর অর্থ বোঝে, তারপরেও এর সাংঘর্ষিক কোন কিছু সে করেছে, এ ক্ষেত্রে সে মুরতাদ বলে গণ্য হবে। আর নয়তো সে কালিমায় শাহাদাহর অর্থই বোঝেনি। এক্ষেত্রে ধরা হবে যে, সে ইসলাম গ্রহণ করার শর্তই পুরণ করেনি। আর সেই শর্ত হলো, এই কালিমার অর্থ সম্পর্কে জানা। এই কালিমা কোন্ কোন্ বিষয়কে নাকচ করছে আর কোন কোন বিষয়কে সাব্যস্ত করছে সে সম্পর্কে জানা। তবে আমরা এই ব্যক্তিকেও মুরতাদ আখ্যা দিবো, কারণ সে নিজেকে মুসলিম দাবি করছে। এ কারণেই এমন ব্যক্তি কোন অবস্থাতেই অজ্ঞতার ওজুহাত পাবে না।

দ্বিতীয়তঃ আল মাসাইলুয যাহেরাহ (المسائل الظاهرة) অর্থাৎ ঐ সমস্ত মাসআলা, যা দ্বীনের অংশ বলে সুনিশ্চিতভাবে জ্ঞাত-

মাসায়েলে যাহেরার উদাহরণ হলো, ঐ সমস্ত সুস্পষ্ট মুতাওয়াতির ফরজ-ওয়াজিব আমল ও সুস্পষ্ট হারাম কাজসমূহ, আরেকজনকে বলতে গিয়ে কিংবা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যেগুলোতে ভুল করা সম্ভব নয়, যেসমস্ত ব্যাপারে তর্ক করা জায়েজ নেই, যে ব্যাপারগুলো সম্পর্কে আম-খাস সকল মুসলিমই

জানে যে, তা দ্বীন-ইসলামের অন্তর্ভূক্ত। যেমন, এই বিষয়টি জানা যে, আল্লাহ সব কিছুর ব্যাপারে ক্ষমতাবান এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। আরো জানা যে, কোরআন আল্লাহর কালাম, ইহুদী-খৃষ্টান ও মুশরিকদের সঙ্গে শত্রুতা করা আবশ্যক, আল্লাহর শরীয়াহর নিকটই বিচার চাওয়া আবশ্যক, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রামাদান মাসের সিয়াম, হজ্ব করা ও যাকাত প্রদান করা আবশ্যক। আরো জানা যে, যিনা করা, হত্যা করা, চুরি করা, মদ খাওয়া বা এ জাতীয় বিষয়গুলো হারাম। এক কথায় যেসমস্ত বিষয় বিশ্বাস করা, মুখে বলা বা আমল করতে বান্দা বাধ্য।

এই সকল ক্ষেত্রেও কারো অজ্ঞতার ওজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়, কেবল এমন ব্যক্তি ব্যতীত, যে 'মাযান্নাতুল ইলম' এর বাইরে অবস্থান করে। মাযান্নাতুল ইলম হলো, তার নিকট ইলম পৌঁছা সম্ভব হওয়া কিংবা তার পক্ষে ইলমের কাছে পৌঁছা সম্ভব হওয়া। পাশাপাশি নিজে নিজেই কিংবা তার সামর্থের মধ্যে কোন 'মাধ্যমে' ইলম বোঝা সম্ভব হওয়া। যেমন, যে ব্যক্তি ইলমী পরিবেশ থেকে অনেক দূরে কোন মরু অঞ্চলে আছে কিংবা যে ব্যক্তি নতুন মুসলিম হয়েছে। অথবা এ জাতীয় কেউ।

তৃতীয়তঃ সুক্ষ্ম মাসআলাসমূহ (আল মাসায়িলুল খাফিয়্যাহ المسائل الخفية)। অর্থাৎ ঐ মাসআলাসমূহ, যেগুলোর দলীল সুক্ষ্ম হয়ে থাকে। যেমন, তাকদীর ও ইরজা সংক্রান্ত কিছু মাসআলা, বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যা, বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর কৃত ওয়াদা ও শাস্তির হুমকি সংক্রান্ত কিছু মাসআলা। আবার আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সংক্রান্ত কিছু মাসআলা, যেমন (বিশেষ সময়ে) আল্লাহর অবতীর্ণ হওয়া, আল্লাহকে দেখতে পাওয়া এবং আল্লাহর জন্য হাত সাব্যস্ত হওয়া এ জাতীয় যেসমস্ত মাসআলা একমাত্র খাস কিছু ব্যক্তিই জানে; আম মানুষ নয়।

তো এসমস্ত মাসআলার ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির অজ্ঞতার ওজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে এবং এগুলোর বিপরীত সে কিছু করে ফেললে তার সামনে দলীল উপস্থাপন না করে এবং তার সংশয় দূর না করে তাকে তাকফীর করা যাবে না।

গুনাহ

আপনাকে জানতে হবে যে, গুনাহ দুই প্রকার। কবীরা গুনাহ ও সগীরা গুনাহ। (আল্লাহ যেন আপনাকে তাঁর আনুগত্যের পথ দেখান)

কবীরা গুনাহ- ঐ সমস্ত গুনাহকে কবীরাহ গুনাহ বলা হয়, যেগুলো করলে দুনিয়াতে হুদুদ[১] অপরিহার্য হয় এবং আখেরাতে বড় ধরণের শাস্তি পেতে হয়। যেমন যিনা করা, মদপান করা, সুদী লেনদেন করা, কাউকে হত্যা করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া, কাউকে অশ্লীল কাজের অপবাদ দেওয়া, মিথ্যা বলা, কওমে লুতের অপকর্ম করা (সমকামিতা), এতীমের মাল খেয়ে ফেলা, গীবত করা, চোগলখুরি করা ও কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা ইত্যাদি।

আহলুস সুন্নাহপন্থীদের আক্বীদা হলো, কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে কবীরা গুনাহকারী ব্যক্তিদের ঈমান ত্রুটিযুক্ত হয়। তওবা না করে মৃত্যুবরণ করলে তারা আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে। আল্লাহ চাইলে তাদেরকে ক্ষমা করে তাদেরকে জান্নাতে দাখেল করবেন কিংবা চাইলে তাদের গুনাহ অনুযায়ী তাদেরকে জাহান্নামে রাখবেন। তবে ঈমান ও তাওহীদ বিদ্যমান থাকার কারণে পরবর্তীতে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ সব কিছুই সহীহ হাদীসে উল্লিখিত আছে। কবীরা গুনাহ সংক্রান্ত শরীয়াহর নসগুলোকে[২] নুসুসুল ওয়ীদ বা ভীতিপ্রদর্শনমূলক নুসুস বলা হয়। এই আয়াত ও হাদীসের ভাষ্যগুলোই মূলত এই গুনাহের কাজটি যে নিন্দাযোগ্য, বিপজ্জনক ও একজন মুসলিমের জন্য হারাম তার প্রমাণ বহন করে। কিন্তু এই নসগুলো এমন কোন প্রমাণ বহন করে না যে, কবীরা গুনাহ করলে কেউ কাফের হয়ে যাবে। দেখুন, একজন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করা কঠিনতম কবীরা গুনাহ। এতদসত্বেও আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ.

---

[১] শরীয়াহকর্তৃক নির্ধারিত কিছু বড় শাস্তিকে হুদুদ বলা হয়। যেমন, হত্যা, রজম, ১০০টি বেত্রাঘাত ইত্যাদি।

[২] নস বলা হয় যেই আয়াত বা হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা হয়ে থাকে। বহুবচন নুসুস।

{তবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কোন ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার রক্তপণ প্রদান করা কর্তব্য।} আল বাকারা- **১৭৮**। দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে হত্যাকারীর ভাই হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অথচ কোন কাফের কোনদিন কোন মুসলিমের ভাই হতে পারে না।

তবে যেসব ক্ষেত্রে এমন দলীল পাওয়া যায় যে, কবীরা গুনাহকারী ব্যক্তিকে কাফের বা ঈমানহারা বলা হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে মূলত উদ্দেশ্য হলো, 'ঈমান যেভাবে আনয়ন করা ওয়াজিব সেভাবে আনয়ন করা হয়নি' বোঝানো। এক্ষেত্রে কুফর দ্বারা কুফরে আসগর উদ্দেশ্য, যা একজন মুসলিমকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয় না। কারণ ঐ নুসুসগুলোতেই প্রমাণ আছে যে, মূল ঈমান এখনো বাকি আছে।

সগীরা গুনাহ- যেসমস্ত গুনাহ করলে দুনিয়ার বিচারে কোন শাস্তি নেই এবং আখেরাতেও কোন শাস্তির কথা উল্লেখ নেই ওগুলোকেই সগীরা গুনাহ বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِنۡ تَجۡتَنِبُوۡا کَبَآئِرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ نُکَفِّرۡ عَنۡکُمۡ سَیِّاٰتِکُمۡ وَ نُدۡخِلۡکُمۡ مُّدۡخَلًا کَرِیۡمًا.

{তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা কবীরা গুনাহ তা থেকে বিরত থাকলে আমি তোমাদের ছোট গুনাহগুলো ক্ষমা করব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব।} আন নিসা- **৩১**। নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ.

"তোমরা ছোট ছোট তুচ্ছ পাপ থেকেও দূরে থাকো, কারণ একজন ব্যক্তির মাঝে এগুলো জমা হতে হতে এক সময়ে তাকে ধ্বংস করে দেয়।" মুসনাদে আহমাদ[১]- **৩৮১৮**

একটি মাসআলা- ধারাবাহিকভাবে সগীরা গুনাহ করার ব্যাপারে সতর্ক থাকা চাই। কারণ ধারাবাহিকভাবে করলে সগীরা গুনাহ আর সগীরা থাকে

---

[১] মুহাক্কিক হাদীসটিকে হাসান লিগইরিহি বলেছেন। বিস্তারিত মূল কিতাবে দেখুন। প্রকা. মুয়াসসাতুর রিসালাহ।

না আবার ইস্তেগফার করলেও কোন কবীরা গুনাহ আমলনামায় থাকে না। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَ الَّذِيۡنَ اِذَا فَعَلُوۡا فَاحِشَةً اَوۡ ظَلَمُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسۡتَغۡفَرُوۡا لِذُنُوۡبِهِمۡ ۟ وَ مَنۡ يَّغۡفِرُ الذُّنُوۡبَ اِلَّا اللّٰهُ ۟ وَ لَمۡ يُصِرُّوۡا عَلٰى مَا فَعَلُوۡا وَ هُمۡ يَعۡلَمُوۡنَ.

{আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের গুনাহের জন্য ইস্তেগফার করে। আর আল্লাহ ছাড়া কে আছে গুনাহ মাফ করবে? এবং তারা যা করে ফেলে, জেনে-বুঝে তারা তা পুনরায় করতে থাকে না। } আলে ইমরান- **১৩৫**

একটি সতর্কতা- প্রকাশ্যে গুনাহ করার ব্যাপারেও সতর্ক থাকা চাই। কারণ নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ.

“আমার সকল উম্মাহ ক্ষমাপ্রাপ্তদের মধ্যে আছে; কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের অপরাধ প্রকাশকারী, সে ক্ষমাপ্রাপ্তদের মধ্যে নয়।” সহীহ বুখারী- **৫৭২১**। সুতরাং কেউ যদি গুনাহ করে ফেলে তখন তার জন্য আবশ্যক হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খালেসভাবে তওবা করা। গুনাহ থেকে সরে আসা। গুনাহ বর্জন করা। পূর্বের গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং ‘আর করব না’ মর্মে প্রতিজ্ঞা করা।

ঈমান

ঈমান কাকে বলে?

ঈমান হলো, আল্লাহর প্রতি, সকল ফেরেশতা, সকল আসমানী কিতাব, সকল নবী-রাসুল ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং ভালো-খারাপ সব রকম তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস রাখা। ঈমান হলো কথা ও কাজের নাম। অর্থাৎ অন্তর ও যবানের কথা এবং অন্তর, যবান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজের নাম। আল্লাহর আনুগত্য করার মাধ্যমে ঈমান বাড়ে এবং গুনাহের কারণে ঈমান হ্রাস পায়।

তবে এই মতটি বেদাতী ও মুরজিয়াদের বিপরীত একটি মত। তারা মূলতঃ আমল বা কাজকে ঈমান থেকে বহির্ভূত মনে করে। অথচ তাদের এই মতটি আল্লাহ তা'আলার এই কথার বিপরীত যে, তিনি বলেন,

وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ.

{আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করে দিবেন।} আল বাকারা- ১৪৩। কারণ এই আয়াত তখনই নাযিল হয় যখন কিছু লোক কিবলা পরিবর্তন হওয়ার পূর্বে বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে তাদের আদায় করা সালাতগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, ঐ সালাতগুলো কবুল হবে কিনা? আর সালাত কিন্তু একটি আমল। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ এই আয়াতে তাদের পূর্বের সালাতগুলো অর্থাৎ আমলগুলোকে ঈমান বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ঈমান কথা ও কাজের নাম।

আহলুস সুন্নাহর এই মতটি খারেজীদের মতেরও বিপরীত। খারেজীরা বলে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আদায় করতে হয় এমন সকল ফরজ আমল ঈমানের রোকনের অংশ। এই সূত্র ধরেই তারা ফরজ তরক করার কারণে ও হারাম কাজ করার কারণে মুসলিমদেরকে তাকফীর করে।

ঈমানের রোকন-

ঈমানের রোকন ৬টি। এই ছয়টি রোকন হাদীসে জিবরীল নামে পরিচিত একটি হাদীসে উল্লিখিত আছে। জিবরীল আ. নবী সা. এর কাছে ঈমানের

ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলেন। নবী সা. বলেছিলেন, "ঈমান হলো, আল্লাহ, সকল ফেরেশতা, আল্লাহর সমস্ত কিতাব, আল্লাহর সকল রাসুল ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং ভালো-খারাপ কদরের (তাকদীরের) প্রতি বিশ্বাস রাখা।" সহীহ মুসলিম- ০৮। নিম্নে বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো-

প্রথম রোকন- আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার মাঝে তিনটি বিষয় নিহিত-

১- এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহই একমাত্র রব, যার কোন শরীক নেই। রব বলা হয় এমন সত্তাকে যিনি সৃষ্টি করেন, রাজত্ব করেন এবং নির্দেশ প্রদান করেন। সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত কোন সৃষ্টিকর্তা ও কোন মালিক নেই। সকল নির্দেশনা একমাত্র তাঁরই। সমস্ত মাখলুক তাঁরই সৃষ্টি। সকল রাজত্ব তাঁরই মালিকানাধীন। সকল নির্দেশনা তাঁরই হুকুমে। তিনি পরাক্রমশালী, চির দয়াময়। তিনি অমুখাপেক্ষী, চির প্রশংসিত। তাঁর নিকট দয়া চাওয়া হলে তিনি দয়া করেন। ক্ষমা চাওয়া হলে ক্ষমা করেন। যেকোন কিছু চাইলে তিনি তা দান করেন। তাকে ডাকলে তিনি সে ডাকে সাড়া দেন। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ط تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.

{জেনে রাখো! সৃজন ও নির্দেশনা তাঁরই। সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ কত বরকতময়!} আল আ'রাফ- ৫৪। তিনি আরো বলেন,

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا فِيْهِنَّ ط وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

{আসমান ও যমিনসমূহ এবং এতোদুভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে সকল কিছুর রাজত্ব আল্লাহরই। আর তিনি সকল কিছুর ব্যাপারে ক্ষমতাবান।} আল মায়িদা- ১২০

২- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উলুহিয়্যাত বা মা'বুদ হওয়ার ব্যাপারে ঈমান আনা।

অর্থাৎ আমরা এই বিষয়টি জেনে নিবো এবং একীন রাখব যে, একমাত্র আল্লাহই প্রকৃত মা'বুদ। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনিই একমাত্র ইবাদাতের হক্কদার। সুতরাং যেহেতু তিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক, সেহেতু তিনি সমস্ত জগতের মা'বুদও বটে। পরিপূর্ণ নমনীয়তা, ভালোবাসা ও তা'জীমের সাথে আমরা তাঁর দেখানো পদ্ধতিতে তাঁর ইবাদাত করব। আমরা নিশ্চিতরূপে এই বিষয়টি মনে রাখব যে, আল্লাহ রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে যেমন একমাত্র সত্তা, তাঁর কোন শরীক নেই, তেমনি উলুহিয়্যাতের ক্ষেত্রেও তিনি একমাত্র সত্তা। তার কোন শরীক নেই। তাই আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করব এবং তিনি ব্যতীত অন্য সমস্ত কিছুর ইবাদাত বর্জন করব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ.

{আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, দয়াময়, অতি দয়ালু তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই।} আল বাকারা- ১৬৩। আল্লাহই প্রকৃত মা'বুদ। আল্লাহ ব্যতীত যেসমস্ত মা'বুদ রয়েছে তাদের মা'বুদ হওয়ার যোগ্যতা বাতিল। তাদের ইবাদাতও বাতিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِه هُوَ الْبَاطِلُ وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ.

{এজন্যেও যে, নিশ্চই আল্লাহ, তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা তো বাতিল। আর নিশ্চয় আল্লাহ, তিনিই সমুচ্চ, সুমহান।} আল হাজ্ব- ৬২

৩- আল্লাহর নাম ও গুণাবলির প্রতি ঈমান আনা। এর অর্থ হলো, আল্লাহর সকল নাম ও গুণাবলি বোঝা। মুখস্থ করা। এগুলোকে স্বীকার করা। এগুলো অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদাত করা এবং এগুলোর দাবি অনুযায়ী আমল করা। কারণ আল্লাহর আজমত, অহংকার, মর্যাদা ও মহত্ত্ব ইত্যাদি গুণাবলি সম্পর্কে জানা থাকলে একজন বান্দার অন্তর আল্লাহর ভয় ও সম্মানে পরিপূর্ণ থাকে। আমরা নিশ্চিতরূপে মনে রাখব যে, আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম ও বড় বড় গুণ। এগুলোর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নিকট দু'আ করব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ لِلّٰهِ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰی فَادۡعُوۡهُ بِهَا ۪ وَ ذَرُوا الَّذِیۡنَ یُلۡحِدُوۡنَ فِیۡۤ اَسۡمَآئِهٖ ؕ سَیُجۡزَوۡنَ مَا کَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ.

{আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। সুতরাং তোমরা সেসব নামেই তাকে ডাকো। আর যারা তাঁর নাম সম্বন্ধে বক্রপথ অবলম্বন করে তাদেরকে বর্জন কর, তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে অবশ্যই দেওয়া হবে।} আল আ'রাফ- **১৮০**। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য ঐ সমস্ত নাম ও গুণাবলিই সাব্যস্ত করি যা তিনি নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন কিংবা রাসুল সা. বলে গেছেন। আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান আনি এবং এগুলোর কারণে যে অর্থ ও ফলাফল দাঁড়ায় তাতেও ঈমান আনি।

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ 'রহীম'। এর অর্থ হলো, তিনি রহমতের অধিকারী। এই নামের একটি ফলাফল হলো, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দয়া করেন। অন্যান্য নামের ব্যাপারেও একই কথা। আমরা তাই সাব্যস্ত করি যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার শানে উপযুক্ত। এক্ষেত্রে কোন বিকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করি না। কোন অর্থকে অস্বীকার করি না। কোন নাম বা গুণের ধরণ বর্ণনা করি না এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই কথার কারণে কোন উদাহরণও সাব্যস্ত করি না যে, তিনি বলেছেন,

لَیۡسَ کَمِثۡلِهٖ شَیۡءٌ.

{তাঁর মতো কোন কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।} আশ শুরা- **১১**

সারকথা হলো, আল্লাহর নাম ও গুণাবলির প্রতি ঈমান মূলতঃ ৩টি উসুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত-

প্রথমতঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সত্তা এবং নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে তিনি মাখলুকের অনুরূপ হওয়া থেকে তাকে পবিত্র ঘোষণা করা।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ যেসমস্ত নাম ও গুণ দ্বারা নিজের ব্যাপারে বর্ণনা দিয়েছেন কিংবা আল্লাহর রাসুল যেভাবে তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন সেগুলোর প্রতি ঈমান আনা।

তৃতীয়তঃ আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ধরণ সম্পর্কে জানার আগ্রহ একেবারেই সংবরণ করা। আমরা যেমন তার সত্তার ধরণ সম্পর্কে জানি না, তেমনি তার নাম ও গুণাবলির ধরণ সম্পর্কেও জানি না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ليس كمثله شيء **{তাঁর মতো কোন কিছুই নেই।}** আশ শুরা-১১

দ্বিতীয় রোকন- ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো, এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহর কিছু ফেরেশতা রয়েছেন। যারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। তারা আল্লাহ ও তাঁর সকল রাসুল (আলাইহিমুস সালাম) এর মাঝে বার্তাবাহক। সুতরাং তারা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার বান্দা। আল্লাহ তাদেরকে তাঁর ইবাদাতের জন্য নুর থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারা পানাহার করেন না। বিবাহ-শাদী করেন না। আল্লাহ তাদেরকে যে আদেশ করেন তার অন্যথা করেন না। তারা না আল্লাহর কন্যা, না তাঁর পুত্র সন্তান, না তাঁর অংশীদার আর না তাঁর সমকক্ষ। জালেমরা, আল্লাহকে অস্বীকারকারীরা ও নাস্তিকরা যা বলে আল্লাহ তা থেকে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। তাদের সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আল্লাহ তাদের মধ্য থেকে যাদের নাম বলেছেন তাদেরকে আমরা বিশ্বাস করি। যেমন জিবরীল আ.। তাদের যেসমস্ত বৈশিষ্ট ও কাজের কথা আমরা জেনেছি তা আমরা বিশ্বাস করি। তবে তাদের মধ্য থেকে যাদের নাম আমরা জানি না তাদের ব্যাপারে এজমালীভাবে[1] ঈমান আনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَه ط بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ. لَا يَسْبِقُوْنَه بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِاَمْرِه يَعْمَلُوْنَ. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يَشْفَعُوْنَ لا اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَ هُمْ مِّنْ خَشْيَتِه مُشْفِقُوْنَ. وَ مَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِه فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ط كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ.

{আর তারা বলে, দয়াময় (আল্লাহ) সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র মহান! তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা তাঁর আগে বেড়ে কথা বলে না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা সবই তিনি জানেন। আর তারা সুপারিশ করে

---

[1] এজমালী শব্দটি তাফসীল শব্দের বিপরীত। তাফসীল অর্থ বিস্তারিত।

শুধু তাদের জন্যই যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। তারা তার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত। আর তাদের মধ্যে যে বলবে, তিনি ব্যতীত আমিই ইলাহ, তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তির প্রতিদান দেব; এভাবেই আমি যালেমদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।} আল আম্বিয়া- ২৬-২৯

তৃতীয় রোকন- আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা

আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো, এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের হিদায়াতের জন্য তাঁর নবী-রাসুলদের ওপর কিছু কিতাব নাযিল করেছেন। এই কিতাবগুলো বাস্তবিক অর্থেই আল্লাহর কথা বা কালাম। এই কিতাবসমূহে যা কিছু আছে সবই সত্য, কোন সন্দেহ নেই। এগুলোর মধ্যে কিছু কিতাবের নাম আল্লাহ আমাদেরকে বলেছেন আর অনেক কিতাবের নাম ও সেগুলোর সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাই জানেন।

একটি মাসআলা- ইহুদী-খৃষ্টানদের কাছে বর্তমানে যে কিতাবগুলো আছে সেগুলোর হুকুম কী?

ইহুদী-খৃষ্টানদের হাতে তাওরাত-ইঞ্জিল নাম দিয়ে যে কিতাবগুলো বর্তমানে আছে সেগুলোর ব্যাপারে এ কথা বলা ঠিক হবে না যে, এগুলো সম্পূর্ণটাই আল্লাহর কোন নবী বা রাসুলের প্রতি নাযিল হয়েছিল। কারণ এই কিতাবগুলো অনেক বিকৃতি ও পরিবর্তনের শিকার হয়েছে। যেমন আল্লাহর সন্তান থাকার বিষয়, ঈসা আ.কে খৃষ্টানদের মা'বুদ বানানো। আল্লাহ সম্পর্কে এমন সব বর্ণনা, যা তার শানোপযোগী নয়। আম্বিয়া কেরামের ওপর বিভিন্ন তোহমত দেওয়াসহ আরো নানান কিছু। সুতরাং এগুলোর প্রত্যেকটি প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং একমাত্র কোরআন-সুন্নাহয় যতটুকু এসেছে ততটুকুই বিশ্বাস করতে হবে।

তো ইহুদী-খৃষ্টানরা যদি আমাদেরকে এমন কিছু বলে, যে ব্যাপারে কোরআনে কোন আলোচনা আসেনি, কিন্তু তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কোন কথার খেলাফও নয় তাহলে আমরা তা বিশ্বাস করব না আবার অবিশ্বাসও করব না। আমরা বলব, 'আমরা আল্লাহর প্রতি, তাঁর সমস্ত গ্রন্থ ও তাঁর রাসুলদের প্রতি ঈমান আনলাম।' এভাবে দেখা যাবে, ইহুদী-

খৃষ্টানরা আমাদেরকে যেটা বলবে সেটা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমাদের তা মিথ্যা মনে করা লাগল না আবার যদি তা মিথ্যা হয়ে থাকে তাহলে আমাদের তা সত্য মনে করা লাগল না।

পক্ষান্তরে যেই কোরআন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ সা. এর ওপর নাযিল করেছেন সেটিই হলো সর্বশেষ আসমানী কিতাব। কোরআন পূর্বের সকল আসমানী কিতাবের সাক্ষী। আল্লাহ সব কিছুর ব্যাখ্যাস্বরূপ ও জগৎবাসীর জন্য হিদায়াত ও রহমতস্বরূপ সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় এই কোরআন নাযিল করেছেন। সুতরাং প্রত্যেকের ওপর আবশ্যক হলো, কোরআনের প্রতি ঈমান আনা। কোরআন অনুযায়ী আমল করা এবং কোরআন থেকে শিক্ষা নিয়ে উত্তম চরিত্র গঠন করা।

কোরআন নাযিল হওয়ার পর এখন কোরআন ছাড়া অন্য কোন কিতাব অনুযায়ী আমল করলে আল্লাহ তা কবুল করবেন না। কারণ আল্লাহ তা'আলা কোরআন হেফাজত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাই যেকোন বিকৃতি, পরিবর্তন ও সংযোজন-বিয়োজন থেকে কোরআন মুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا الذِّکۡرَ وَ اِنَّا لَہٗ لَحٰفِظُوۡنَ.

{নিঃসন্দেহে আমিই কোরআন নাযিল করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষক।} আল হিজর- ০৯। তিনি আরো বলেন,

وَ اَنۡزَلۡنَاۤ اِلَیۡکَ الۡکِتٰبَ بِالۡحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیۡنَ یَدَیۡہِ مِنَ الۡکِتٰبِ وَ مُہَیۡمِنًا عَلَیۡہِ فَاحۡکُمۡ بَیۡنَہُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰہُ وَ لَا تَتَّبِعۡ اَہۡوَآءَہُمۡ عَمَّا جَآءَکَ مِنَ الۡحَقِّ ط لِکُلٍّ جَعَلۡنَا مِنۡکُمۡ شِرۡعَۃً وَّ مِنۡہَاجًا ط وَ لَوۡ شَآءَ اللّٰہُ لَجَعَلَکُمۡ اُمَّۃً وَّاحِدَۃً وَّ لٰکِنۡ لِّیَبۡلُوَکُمۡ فِیۡ مَاۤ اٰتٰىکُمۡ فَاسۡتَبِقُوا الۡخَیۡرٰتِ ط اِلَی اللّٰہِ مَرۡجِعُکُمۡ جَمِیۡعًا فَیُنَبِّئُکُمۡ بِمَا کُنۡتُمۡ فِیۡہِ تَخۡتَلِفُوۡنَ.

{আর আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি ইতোপূর্বেকার কিতাবসমূহের সত্যতা প্রতিপন্নকারী ও সেগুলোর তদারককারীরূপে। সুতরাং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী আপনি তাদের বিচার নিষ্পত্তি করুন এবং যে সত্য আপনার নিকট এসেছে তা ছেড়ে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই আমি

একটা করে শরীয়ত ও স্পষ্টপথ নির্ধারণ করে দিয়েছি। আর আল্লাহ ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে এক উম্মত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। কাজেই সৎকাজে তোমরা প্রতিযোগিতা করো। আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।} আল মায়িদা- ৪৮

চতুর্থ রোকন- রাসুলদের প্রতি ঈমান আনা

রাসুলদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ প্রত্যেক উম্মাহর নিকট একজন রাসুল পাঠিয়েছেন। তিনি তাদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা এবং আল্লাহ ব্যতীত যা কিছুর ইবাদাত করা হয় সেগুলোকে অস্বীকার করার দাওয়াত দিতেন। তারা সকলেই প্রেরিত ও সত্যবাদী। আল্লাহ তাদেরকে যা কিছু দিয়ে প্রেরণ করেছেন এমন সব কিছুই তারা পৌঁছে দিয়েছেন। তাদের মধ্য থেকে কারো কারো নাম আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন আর কারো কারো নাম তিনি নিজের কাছে সংরক্ষিত রেখেছেন। তাই আমাদের ওপর আবশ্যক হলো সকল রাসুলের প্রতি ঈমান আনা। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

{রাসুল তাঁর নিকট তাঁর রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছেন, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসুলগণের ওপর, আমরা তাঁর রাসুলগণের কারও মাঝে পার্থক্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।} আল বাকারা- ২৮৫। এই বিশ্বাসও করা যে, সকল নবী-রাসুলের দ্বীন একটিই। তবে তাদের শরীয়াহ (ফিকহী বিধি-বিধান) বিভিন্ন। সর্বপ্রথম রাসুল সর্বশেষ রাসুলের আগমনের সুসংবাদ দিয়ে থাকেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনেন। আবার সর্বশেষ

রাসুল সর্বপ্রথম রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তিনিও তাঁর প্রতি ঈমান আনেন। নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى بن مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ.

"আমি দুনিয়া ও আখেরাতে ঈসা ইবনে মারইয়ামের ঘনিষ্ঠতম। নবীগণ একে অন্যের বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁদের মা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু তাদের দ্বীন এক।" সহীহ বুখারী- ৩২৫৯

সর্বপ্রথম যে রাসুলকে আল্লাহ দুনিয়াবাসীর জন্য পাঠিয়েছিলেন তিনি হলেন, নুহ আলাইহিস সালাম। আল্লাহ তাকে এক কাফের জাতির উদেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। উদ্দেশ্য, তাদেরকে আল্লাহর পথে ডাকা, একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করতে বলা এবং শিরক করতে নিষেধ করা। আমরা বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মাদ সা. সর্বশেষ নবী ও রাসুল। আল্লাহ তা'আলার নিকট তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক। তাকে প্রেরণ করা হয়েছিল সকল মানুষের নিকট। কোন মানুষের জন্য তাঁর শরীয়াহর গণ্ডি থেকে বের হওয়ার সুযোগ নেই। এমনকি ঈসা আলাইহিস সালামের জন্যও নয়। তিনি যখন শেষ যামানায় অবতরণ করবেন তখন তিনিও রাসুল সা. এর শরীয়াহর অনুগামীই থাকবেন।

পঞ্চম রোকন- শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনা

শেষ দিবস মানে কী? শেষ দিবস মানে হলো কেয়ামতের দিন। এদিন আল্লাহ হিসাব গ্রহণের জন্য এবং প্রতিদান দেওয়ার জন্য সকল মাখলুককে পুনরায় জাগ্রত করবেন। কেয়ামতের দিনকে শেষ দিবস বলার কারণ হলো, এই দিবসের পর আর কোন দিবস নেই। এই দিন জান্নাতীগণ জান্নাতে চলে যাবেন আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাবে। শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এই মহান দিবস সম্পর্কে যা যা বলেছেন সব কিছু বিশ্বাস করা। যেমন, পুনরুত্থান, হিসাবের জন্য কবর থেকে বের হওয়া, হিসাব-নিকাশ, পুলসিরাত, দাঁড়িপাল্লা, জান্নাত-জাহান্নাম বা এজাতীয় আরো যা কিছু কেয়ামতের ময়দানে ঘটবে। রসুলুল্লাহ সা. তাহাজ্জুদের সালাতে দু'আ করতেন এবং বলতেন,

وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ.

"...এবং সকল প্রশংসা আপনারই জন্য। আপনিই হক্ব। আপনার ওয়াদা সত্য। আপনার কথা সত্য। আপনার সাক্ষাৎ সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য এবং কেয়ামত সত্য।" সহীহ বুখারী- **১০৬৯**

এগুলোর সঙ্গে আরো যুক্ত হবে, মানুষের মৃত্যুর আগে কেয়ামতের ছোট-বড় আলামতসমূহ এবং মৃত্যুর পর কবরের ফেতনা, কবরের আযাব ও কবরের নেয়ামত সম্পর্কিত যা কিছু ঘটবে। রসুলুল্লাহ সা. বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জাহান্নামের আযাব ও জাহান্নামের ফেতনা থেকে এবং কবরের ফেতনা ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই।" সহীহ বুখারী- ৬০১৪

ষষ্ঠ রোকন- কদর (তাকদীর) এর প্রতি ঈমান আনা

কদর (القدر) এর অর্থ- সমস্ত কিছুর ব্যাপারে আল্লাহর ইলম থাকা। আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছেন এবং মাখলুককর্তৃক যা কিছু ঘটার ইচ্ছা করেছেন এমন সব কিছু সম্পর্কে আল্লাহর ইলম থাকা। বিভিন্ন কিছুর জগৎ, বিভিন্ন ঘটনা ও বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে তাঁর ইলম থাকা। এগুলোকে নির্ধারণ করা এবং লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদিকে কদর বলে। কদর বা তাকদীর হলো সৃষ্টি জগতের মাঝে নিহিত আল্লাহর একটি রহস্য। তাকদীর না কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা জানতে পেরেছেন আর না কোন নবী-রাসুল জানতে পেরেছেন। আর কদর (তাকদীর) এর প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো, এই আক্বীদা রাখা যে, ভালো-খারাপ যা কিছু ঘটে অর্থাৎ সমস্ত কিছুই আল্লাহর ফয়সালা ও নির্ধারণের কারণেই হয়ে থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

اِنَّا كُلَّ شَىۡءٍ خَلَقۡنٰهُ بِقَدَرٍ.

{নিশ্চই আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী।} আল ক্বমার- ৪৯

কদরের প্রতি ঈমানের কয়েকটি স্তর। কদরের প্রতি ঈমানের মাঝে চারটি বিষয় নিহিত-

১- এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ সব কিছু সমষ্টিগতভাবে ও বিস্তারিত জানেন। তিনি বলেন,

وَ مَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّ مَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّ لَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ط وَ مَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِى السَّمَآءِ وَ لَاۤ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَ لَاۤ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ.

{আর আপনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন এবং আপনি সে সম্পর্কে কুরআন থেকে যা-ই তিলাওয়াত করেন এবং তোমরা যে আমলই করো না কেন, আমি তোমাদের সাক্ষী থাকি, যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও। আর আসমানসমূহ ও যমীনের অণু পরিমাণও আপনার রবের দৃষ্টির বাইরে নয় এবং তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।} ইউনুস- ৬১

২- এই বিশ্বাস করা যে, মাখলুক এবং মাখলুকের বিভিন্ন অবস্থা ও তাদের রিযিকসহ সমস্ত কিছুর পরিমাণ আল্লাহ লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ط اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ.

{আপনি কি জানেন না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন। এসবই তো আছে এক কিতাবে; নিশ্চয় তা আল্লাহর নিকট অতি সহজ।} আল হাজ্ব- ৭০

৩- এই বিশ্বাস করা যে, সমস্ত কিছু আল্লাহর ইচ্ছা ও এরাদাতেই হয়ে থাকে। সব কিছু আল্লাহর ইচ্ছাতেই ঘটে থাকে। সুতরাং আল্লাহ যা চান তাই হয় আর তিনি যা চান না তা হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ.

{আর আল্লাহ যা চান তাই করেন।} ইবরাহীম- ২৭

৪- এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সমস্ত কিছুর সত্তা, বৈশিষ্ট ও সেগুলোর নড়াচড়া। তিনি ব্যতীত আর কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। তিনি ব্যতীত অন্য কোন রব নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَیۡءٍ ۫ وَّ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیۡءٍ وَّكِیۡلٌ.

{আল্লাহ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।} আয যুমার-৬২

মাসআলা- তাকদীরের দোহাই দিয়ে কি গুনাহ করা ঠিক হবে?

যেমন কোন গুনাহগার ব্যক্তি বলল, 'আমি গুনাহ করি এজন্য যে, আল্লাহ সেটা আমার তাকদীরে লিখে রেখেছেন।' মূলতঃ গুনাহের ব্যাপারে তাকদীরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা দুই রকম হতে পারে-

- গুনাহের কাজটা অতীতে সংঘটিত হয়েছে এবং সেটা থেকে তওবাও করা হয়েছে। তারপরেও এটা নিয়ে কেউ যদি তিরস্কার করে কিংবা ব্যাখ্যা জানতে চায় তখন তাকদীরকে ওজর হিসেবে উত্থাপন করা সঠিক। এ ব্যাপারে আদম আ. ও মুসা আ. এর ঘটনা সম্বলিত হাদীস রয়েছে। আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি নবী সা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন,

احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى.

"আদম ও মুসা আ. (পরস্পরে) বাদানুবাদ করেন। মুসা আ. বলেন, হে আদম, আপনি আমাদের পিতা। আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করেছেন এবং জান্নাত থেকে আমাদেরকে বের করেছেন। আদম আ. তাকে বললেন, হে মুসা! আল্লাহ আপনাকে তো নিজ কথার মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন এবং আপনার জন্য নিজ হাত দ্বারা লিখেছেন। অতএব আপনি কি আমাকে এমন একটি কাজের ব্যাপারে তিরস্কার করছেন যা আমাকে সৃষ্টি করার চল্লিশ বছর পূর্বেই

আল্লাহ নির্ধারিত করে রেখেছেন? তখন আদম আ. মুসা আ.-এর ওপর তর্কে জয়ী হলেন। এ কথাটি রসুলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বলেছেন।" সহীহ বুখারী- ৬২৪০

তবে এটি তাওবার পরে করা যাবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنۡ رَّبِّه كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيۡهِ ؕ اِنَّه هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيۡمُ.

{তারপর আদম তার রবের কাছ থেকে কিছু বাণী পেলেন। অতঃপর আল্লাহ তার তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনিই তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।} আল বাকারা- ৩৭

- একজন ব্যক্তি ধারাবাহিকভাবে গুনাহের মাঝে ডুবে আছে আবার এর স্বপক্ষে সে তাকদীরের দোহাই দিচ্ছে। এমন কাজ কখনোই ঠিক হবে না। এটা একেবারে হুবহু কাফেরদের সঙ্গে মিলে যায়। এ ব্যাপারে কোরআনে অনেক দলীল রয়েছে। এর মধ্যে একটি দলীল হলো, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ اِذَا فَعَلُوۡا فَاحِشَةً قَالُوۡا وَجَدۡنَا عَلَيۡهَاۤ اٰبَآءَنَا وَ اللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ؕ قُلۡ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاۡمُرُ بِالۡفَحۡشَآءِ ؕ اَتَقُوۡلُوۡنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ.

{আর যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে তখন বলে, 'আমরা এতে আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি এবং আল্লাহ আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন।' বলুন, নিশ্চই আল্লাহ অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জানো না'?} আল আ'রাফ- ২৮। তিনি আরো বলেন,

وَ قَالَ الَّذِيۡنَ اَشۡرَكُوۡا لَوۡ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدۡنَا مِنۡ دُوۡنِه مِنۡ شَیۡءٍ نَّحۡنُ وَ لَاۤ اٰبَآؤُنَا وَ لَا حَرَّمۡنَا مِنۡ دُوۡنِه مِنۡ شَیۡءٍ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ ۚ فَهَلۡ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الۡبَلٰغُ الۡمُبِيۡنُ.

{আর যারা শিরক করেছে, তারা বলল, যদি আল্লাহ চাইতেন তবে আমরা তাকে ছাড়া কোন কিছুর ইবাদাত করতাম না এবং আমাদের পিতৃপুরুষরাও না। আর তাকে ছেড়ে আমরা কোন কিছু হারামও করতাম না। এমনিই করেছে, যারা তাদের পূর্বে ছিল। সুতরাং

স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া ছাড়া রাসুলদের কি কোন কর্তব্য আছে?}
আন নাহল- ৩৫

আল ইহসান

ইহসানের অর্থ হলো, আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবেন যেন আপনি আল্লাহকে দেখছেন। যদি (অবস্থা এমন না হয় যে,) আপনি তাকে দেখেন না তাহলে (এমন ভাব তৈরি করা যে,) নিশ্চই তিনি আপনাকে দেখছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيۡنَ اتَّقَوۡا وَّ الَّذِيۡنَ هُمۡ مُّحۡسِنُوۡنَ.

{নিশ্চই আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা মুহসিন।} আন নাহল- ১২৮

ইহসানের বিভিন্ন স্তর। ইহসানের দুইটি স্তর রয়েছে, যথা-

প্রথম স্তর হলো, মানুষ এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে যেন সে আল্লাহকে দেখছে। এটি হলো আল্লাহর নিকট কিছু তালাশ করা, আল্লাহর প্রতি আগ্রহ পোষণ করা এবং আল্লাহকে ভালোবাসার ইবাদাত। এই স্তরে একজন মানুষ আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার কাছ থেকে কিছু তালাশ করে। আল্লাহর অভিমুখী হয় এবং এমনভাবে তাঁর ইবাদাত করে, যেন আল্লাহ তাকে দেখছেন। এটি দুইটি স্তরের মধ্যে সবচেয়ে ওপরের স্তর। (এই স্তরের দিকে ইঙ্গিত করেই হাদীসে এসেছে)أن تعبد الله كأنك تراه "তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে যেন তুমি তাকে দেখছো।" সহীহ বুখারী- ৫০

দ্বিতীয় স্তর হলো, আপনি যদি এভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে না পারেন যে, আপনি যেন আল্লাহকে দেখছেন এবং তাঁর কাছ থেকে কিছু তালাশ করছেন তাহলে আপনি (এই ভেবে) আল্লাহর ইবাদাত করুন যে, আল্লাহ আপনাকে দেখছেন। অর্থাৎ আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তি, আল্লাহর আযাব ও শাস্তি হতে পলায়নকারী ব্যক্তি এবং আল্লাহর সম্মুখে অবনমিত ব্যক্তির ইবাদাতের মতো।

এই ইহসানের হাকীকত জানার জন্য আরো কিছু আলোচনা করা যাক। যেই হিকমাহর কারণে আল্লাহ আসমান ও যমিনসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন এবং যেই হিকমাহর কারণে আল্লাহ হায়াত

ও মওত সৃষ্টি করেছেন সেই হিকমাহ হলো, কে বেশি সুন্দর আমল করতে পারে সেই পরীক্ষা নেওয়া। তবে আমলকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করার পদ্ধতি হলো, আসমান-যমিনের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। প্রতিটি কাজে আল্লাহর মুরাকাবা বা ধ্যান করা। আল্লাহ সবকিছুর ব্যাপারে সর্বজ্ঞানী, সব কিছুর বাপারে সর্বদ্রষ্টা, একটি কণাও তাঁর আড়ালে নয়- এই কথাগুলো মনে রাখা।

এটি হলো কোরআনে বর্ণিত সবচেয়ে বড় উপদেশ, যা একজন মুসলিমকে একমাত্র রবের জন্যই সুন্দরভাবে তার যাবতীয় আমল করতে উদ্বুদ্ধ করে। তখন সে এমন মোহাব্বত ও ভালোবাসা নিয়ে আল্লাহর জন্যই ইবাদাত পালন করে যে, কেমন যেন সে নিজেই আল্লাহকে দেখছে। তো যদি 'আল্লাহকে সে দেখছে' এমন হালত তৈরি নাও হয় তবুও আল্লাহ তো নিশ্চই তাকে দেখছেন। সুতরাং বান্দার উচিত আল্লাহর জন্যই সুন্দরভাবে আমল করা। কারণ এতে করে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে এবং তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে আমল করবে সে তো নিজের জন্যই তা করবে। আর যে মন্দভাবে আমল করবে সেটা তার ওপরই বর্তাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ هُوَ الَّذِيۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ فِيۡ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّ كَانَ عَرۡشُه عَلَى الۡمَآءِ لِيَبۡلُوَكُمۡ اَيُّكُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا.

{আর তিনিই আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, আর তাঁর আরশ ছিল পানির ওপর, তোমাদের মধ্যে কে আমলে সুন্দরতম তা পরীক্ষা করার জন্য।} হুদ- ০৭

দাসত্ব বা ইবাদাতের পরিপূর্ণতা

আল্লাহর ইবাদাতের ভিত্তি মূলতঃ দুইটি বিষয়ের ওপর। আল্লাহকে চূড়ান্ত ভালোবাসা আর আল্লাহকে চূড়ান্ত তা'জীম করা এবং তাঁর সামনে অবনমিত হওয়া। আল্লাহর নাম, গুণাবলি ও কর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলে বান্দার মাঝে এই সিফতগুলো তৈরি হয়। আল্লাহকে ভালোবাসার ফলে বান্দা আল্লাহকে কামনা করে। আর আল্লাহকে তা'জীম ও তাঁর সামনে অবনমিত হওয়ার ফলে বান্দার মাঝে আল্লাহভীতি তৈরি হয় এবং সে আল্লাহর শাস্তি

হতে পলায়ন করতে থাকে। এটিই হলো আল্লাহর ইবাদাতের ক্ষেত্রে ইহসান অবলম্বন করা বা সুন্দরভাবে আল্লাহর ইবাদাত করার অর্থ। আল্লাহ এমন ইহসান অবলম্বনকারীদেরকে ভালোবাসেন। ওপরের আলোচনার পেছনে কোরআনের কিছু আয়াত উল্লেখ করা হলো-

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ مَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَه لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَّ اتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا.

{আর দীনের ব্যাপারে তার তুলনায় কে সুন্দরতর, যে মুহসিন অবস্থায় আল্লাহর কাছে নিজকে পূর্ণ সমর্পণ করল এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের আদর্শ অনুসরণ করল?} আন নিসা- **১২৫**

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَ مَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗ اِلَى اللّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ط وَ اِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ.

{আর যে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে, এমতাবস্থায় যে সে মুহসিন সে তো দৃঢ়ভাবে ধরলো এক মযবুত হাতল। আর যাবতীয় কাজের পরিণাম আল্লাহরই কাছে।} লুকমান- ২২

তিনি আরো বলেন,

بَلٰى، مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَه لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَه اَجْرُه عِنْدَ رَبِّه ۪ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

{অবশ্যই যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট মুহসিন অবস্থায় আত্মসমর্পণ করে, তার প্রতিদান তার প্রতিপালকের কাছে রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই, তারা দুঃখিতও হবে না।} আল বাকারা- **১১২**

হিজরত

হিজরতের সংজ্ঞা হলো, দারুল কুফর হতে দারুল ইসলামে স্থানান্তরিত হওয়া।

দারুল ইসলাম হলো ঐ ভূখণ্ড, যেখানে ইসলামী বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত এবং যেখানে শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি মুসলিমদের, যদিও ঐ ভূখণ্ডের অধিকাংশ অধিবাসী কাফের হয়। যেমন ইহুদীকর্তৃক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও তাদেরকে দেশান্তর করার আগ পর্যন্ত মদীনার প্রাথমিক অবস্থা ছিলো।

দারুল কুফর হলো ঐ ভূখণ্ড, যেখানে কুফরী বিধান প্রতিষ্ঠিত এবং যেখানে শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কাফেরদের, যদিও ঐ ভূখণ্ডের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলিম হয়। যেমন ওবায়দী সাম্রাজ্য (ফাতেমী), যারা মিশর, শাম ও মরক্কো শাসন করেছিল।

ওপরের সংজ্ঞা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, দারুল কুফর হলেই যে ঐ ভূখণ্ডের সবাই কাফের হবে এমনটি নয়। আবার দারুল ইসলাম হলেই যে সবাই মুসলিম হবে এমনও নয়।

হিজরতের বিধান-

যার ওপর শরীয়াহর বিধি-বিধান পালন করা আবশ্যক এমন প্রত্যেক সামর্থবান মুসলিমের জন্য দারুল ইসলামে হিজরত করা ফরজ। সামর্থ থাকার পরেও কেউ যদি হিজরত না করে তাহলে সে সর্বসম্মতিক্রমে একটি হারাম কাজ করেছে বলেই গণ্য হবে। হিজরতের ওপর ভিত্তি করে অনেক বিধি-বিধান কার্যকর হয়। হিজরতের মাধ্যমে একজন মানুষ কুফর-শিরকে পতিত হওয়া থেকে এবং কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা থেকে বেঁচে যায়।

বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে আছে যে, নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ.

"তারপর তুমি তাদেরকে তাদের ভূখণ্ড হতে মুহাজিরদের ভূখণ্ডে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য বলবে। তুমি তাদেরকে জানাবে যে, তারা যদি এটা করে তাহলে মুহাজিরগণ যা পাবে তারাও তা পাবে এবং মুহাজিরদের যা হবে তাদেরও তাই হবে। তবে তারা যদি তাদের ভূখণ্ড থেকে স্থানান্তরিত হতে না চায় তাহলে তুমি তাদেরকে জানিও যে, তারা মুসলিম বেদুইনদের মতোই বসবাস করবে...।" সহীহ মুসলিম- **১৭৩১**

হিজরত না করার ভয়াবহতা

১- যে ব্যক্তি হিজরত করেনি সে নিজের অজান্তেই কুফরে পতিত হওয়ার আশংকা আছে। যেমন, সে যদি মানবরচিত আইনে বিচার প্রার্থনা করে কিংবা তাগুতের সৈন্যবাহিনিতে যোগদান করে কিংবা সে যদি নির্বাচন করে বা ভোট দেয়।

২- নবী সা. হিজরত না করা ব্যক্তি থেকে নিজেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করেছেন। হাদীসে আছে,

أنا بريء من كل مُسلم يقيم بين أظْهُرِ المشركين.

"আমি এমন প্রত্যেক মুসলিম থেকে দায়মুক্ত, যে মুশরিকদের মাঝে অবস্থান করে।" সুনানে আবু দাউদ- **২৬৪৫**

৩- যে ব্যক্তি হিজরত করেনি তার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করা আমাদের জন্য জায়েজ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ لَمۡ يُهَاجِرُوۡا مَا لَكُمۡ مِّنۡ وَّلَايَتِهِمۡ مِّنۡ شَیۡءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوۡا.

{আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের নেই।} আল আনফাল- ৭২

৪- শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ থাকা সত্বেও যে হিজরত করেনি সে মূলত নিজেকে কঠিন আজাবের সম্মুখীন করতে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِنَّ الَّذِيۡنَ تَوَفّٰٮهُمُ الۡمَلٰۤٮِٕكَةُ ظَالِمِىۡۤ اَنۡفُسِهِمۡ قَالُوۡا فِيۡمَ كُنۡتُمۡ ؕ قَالُوۡا كُنَّا مُسۡتَضۡعَفِيۡنَ فِى الۡاَرۡضِ ؕ قَالُوۡۤا اَلَمۡ تَكُنۡ اَرۡضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوۡا فِيۡهَا ؕ فَاُولٰۤٮِٕكَ مَاۡوٰٮهُمۡ جَهَنَّمُ ؕ وَ سَآءَتۡ مَصِيۡرًا.

{নিঃসন্দেহে ফেরেশতারা যাদের জান কবজ করেছে এমন অবস্থায় যে, তারা নিজেদের প্রতি জুলুমকারী (তাদের উদ্দেশ্যে) ফেরেশতাগণ বলেছেন,

তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলেছে, দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম। তারা (ফেরেশতাগণ) বলেছেন, 'আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিলো না যে তোমরা সেখানে হিজরত করবে? এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কত মন্দ আবাস!} আন নিসা- ৯৭

আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করার কিছু ফজীলত

হিজরতের ফজীলতের জন্য এই আয়াতই যথেষ্ট, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ مَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّ سَعَةً ط وَ مَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِه مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِه ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُه عَلَى اللّٰهِ ط وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

{আর কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করলে সে দুনিয়ায় বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ করবে। আর কেউ আল্লাহ ও রাসুলের উদ্দেশ্যে নিজ ঘর থেকে মুহাজির হয়ে বের হবার পর তার মৃত্যু ঘটলে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্‌র ওপর; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।} আন নিসা- ১০০।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র আরো বলেন,

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ لا اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ط وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ رِضْوَانٍ وَّ جَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ. خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَه اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

{যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তারা আল্লাহর কাছে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। আর তারাই সফলকাম। তাদের রব তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন, তাঁর দয়া ও সন্তোষের এবং এমন জান্নাতের যেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী নেয়ামত। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। নিশ্চই আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরস্কার।} আত তাওবা- ২০-২২

কাদের ক্ষেত্রে হিজরতের বিধান প্রযোজ্য নয়?

ঐ সকল অসহায় মুসলিম, যারা নিজেদের অসহায়ত্বের কারণে ও প্রতিরোধক্ষমতা না থাকার কারণে প্রকাশ্যে দ্বীন পালন করতে পারেন না। আবার নিজেদের অক্ষমতা ও সামর্থহীনতার কারণে হিজরতও করতে

পারেন না। আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতে তাদেরকে হিজরতের বিধান থেকে বাদ রেখেছেন,

اِلَّا الۡمُسۡتَضۡعَفِيۡنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الۡوِلۡدَانِ لَا يَسۡتَطِيۡعُوۡنَ حِيۡلَةً وَّ لَا يَهۡتَدُوۡنَ سَبِيۡلًا.

{যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন পথও পায় না তারা ব্যতীত।} আন নিসা- ৯৮। তিনি আরো বলেন,

وَ مَا لَكُمۡ لَا تُقَاتِلُوۡنَ فِيۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَ الۡمُسۡتَضۡعَفِيۡنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الۡوِلۡدَانِ الَّذِيۡنَ يَقُوۡلُوۡنَ رَبَّنَاۤ اَخۡرِجۡنَا مِنۡ هٰذِهِ الۡقَرۡيَةِ الظَّالِمِ اَهۡلُهَا ۚ وَ اجۡعَلۡ لَّنَا مِنۡ لَّدُنۡكَ وَلِيًّا ۚ ۙ وَّ اجۡعَلۡ لَّنَا مِنۡ لَّدُنۡكَ نَصِيۡرًا.

{আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা যুদ্ধ করবে না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নর-নারী এবং শিশুদের জন্য, যারা বলে, হে আমাদের রব! এ জনপদ-যার অধিবাসী যালিম, তা-থেকে আমাদেরকে বের করুন; আর আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কাউকে অভিভাবক করুন এবং আপনার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের সাহায্যকারী নিযুক্ত করুন।} আন নিসা- ৭৫

এ ক্ষেত্রে দুইটি শর্ত রয়েছে- ১. হিজরতের জন্য বের হতে সক্ষম না হওয়া। ২. হিজরতের পথ না পাওয়া। এর পাশাপাশি তাদের অবস্থা এমন হতে হবে যে, তারা তাদের রবের নিকট দু'আ করবে যেন তিনি তাদেরকে দারুল কুফর থেকে বের করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে এমন কিছু সাহায্যকারী ও অভিভাবক দান করে শক্তিশালী করেন, যারা তাদেরকে কাফেরদের কব্জা থেকে রক্ষা করবেন।

কিছু ভুল ধারণা

১- কিছু মুসলিম ভাই নবী সা. এর একটি হাদীস ভুল বুঝে থাকেন। হাদীসটি হলো,

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا.

"মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই। তবে জিহাদ ও নিয়্যত রয়েছে। যখন তোমাদেরকে জিহাদে বের হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হবে তখন তোমরা বের হয়ে যেও।" সহীহ বুখারী- ২৬৩১। এই হাদীসটি নবী সা. মক্কা বিজয়ের পর বলেছিলেন। لا هجرة بعد الفتح "মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই" এর অর্থ হলো, মক্কা বিজয়ের পর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের বিধান এখন আর আবশ্যক নয়। কারণ মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে মক্কা এখন দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এখন আর মক্কাবাসীদের জন্য মক্কা ছেড়ে মদীনায় যাওয়া আবশ্যক নয়। বরং তারা মক্কাতেই থাকবে। তো দেখা যাচ্ছে এই কথাটি কেবল ঐ সকল সাহাবীর সঙ্গেই খাস, যারা মক্কা বিজয়ের পরও মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করতে চাচ্ছিলেন। মূলত তখনই নবী সা. কথাটি বলেছিলেন। হিজরতের বিধান যে এখনো বলবৎ আছে; রহিত হয়নি এ ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার করে দেয় নবী সা. এর এই হাদীসটি-

لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

"যতদিন তাওবার দরজা বন্ধ না হবে ততদিন হিজরতের বিধান রহিত হবে না। আর তাওবার দরজা ততদিন বন্ধ হবে না যতদিন না পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হচ্ছে।" মুসনাদে আহমাদ[১]- ১৬৯০৬

২- আবার অনেকে মনে করেন, নারীদের জন্য কোন হিজরত নেই। অথচ কথাটি সঠিক নয়। কারণ একজন নারীও হিজরত করতে সমর্থ হলে তার ওপর হিজরত করা ওয়াজিব। সফরে বের হতে হলে একজন নারীর জন্য যেসমস্ত শর্ত প্রযোজ্য হয় এমন কোন শর্তই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। বরং হিজরতের ক্ষেত্রে এই শর্তগুলো ধর্তব্যই নয়। এটি অধিকাংশ

[১] মুহাক্কিক বলেন, হাদীসটি হাসান লিগইরিহি। প্রকা. দারুর রিসালাহ।

আলেমের মত। এটির স্বপক্ষেই দলীল পাওয়া যায়। কারণ প্রথম সারির মুসলিমদের মধ্য থেকে যারা মক্কা থেকে আবেসিনিয়া (হাবাশা) ও মদীনায় হিজরত করেছিলেন তাদের অনেকে ছিলেন নারী।

খিলাফাহ

মানব ও মানবজীবন যেন সুশৃঙ্খল থাকে এজন্য অবশ্যই এমন একজন নেতার প্রয়োজন যিনি তাদের শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। উম্মাহ এ ব্যাপারে ইজমা' করেছে যে, খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করা ফরজ। এ ব্যাপারে দলীল হলো, সাহাবায় কেরামের কাছে আল্লাহর রাসুলের ওফাতের সংবাদ পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই তারা বনু সা-ইদা গোত্রের উঠানে একটি সভার আয়োজন করলেন। এ সভায় বড় বড় সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। এজন্য তারা রাসুলের দাফন-কাফনের কাজটি ছেড়েই চলে এলেন এবং খিলাফাহর ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন। এই পুরো ব্যাপারটি যদি কোন কিছু বুঝিয়ে থাকে তাহলে এটিই বোঝাচ্ছে যে, খিলাফাহর গুরুত্ব ও আবশ্যকতা কতটুকু।

খলীফা হওয়ার শর্তসমূহ-

ফুকাহায় কেরাম খলীফা হওয়ার জন্য কিছু শর্ত নির্ধারণ করেছেন। শর্তগুলো হচ্ছে,

১- মুসলিম হওয়া। ২- মুকাল্লাফ হওয়া (আকেল-বালেগ হওয়া)। ৩- পুরুষ হওয়া। ৪- কুরাইশ বংশের হওয়া। ৫- অন্যের মাধ্যমে হলেও কিফায়াত অর্জিত থাকা। (কিফায়াত হলো, সাহসিকতা, দৃঢ় মনোবল ও অভিজ্ঞতা)। ৬- দাস বা গোলাম না হওয়া। ৭- আদালাতসম্পন্ন হওয়া[১]। ৮- কর্ণ, চোক্ষু ও যবানসহ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমন ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা, যা খলীফার

---

[১] খতীবে বাগদাদী রহ. এর আল কিফায়াহ গ্রন্থে আছে,

إِنَّ الْعَدْلَ هُوَ مَنْ عُرِفَ بِأَدَاءِ فَرَائِضِهِ وَلُزُومِ مَا أُمِرَ بِهِ ، وَتَوَقِّي مَا نُهِيَ عَنْهُ ، وَتَجَنُّبِ الْفَوَاحِشِ الْمُسْقِطَةِ ، وَتَحَرِّي الْحَقِّ وَالْوَاجِبِ فِي أَفْعَالِهِ وَمُعَامَلَتِهِ ، وَالتَّوَقِّي فِي لَفْظِهِ مَا يَثْلِمُ الدِّينَ وَالْمُرُوءَةَ.

'একজন আদালাতসম্পন্ন বা আদেল ব্যক্তি হলেন সেই ব্যক্তি, যার ব্যাপারে জানা যায় যে, তিনি ফরজ আমলসমূহ আদায়ে ও নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকেন, তাকে যা করতে নিষেধ করা হয় তা তিনি পরিহার করেন, অশ্লিলতাবর্জন করেন, নিজ মুয়ামালাত ও মুয়াশারাতে হক্কের ওপরে থাকার চেষ্টা করেন এবং দায়িত্বের প্রতি খেয়াল রাখেন। সর্বোপরি তাঁর দ্বীনদারিতা ও ব্যক্তিত্বে প্রভাব ফেলে এমন ভাষা ব্যবহার করা থেকে বেঁচে থাকেন। আল কিফায়াহ- পৃ. ৮০ প্রকা. জামইয়্যাতু দাইরাতিল মা'আরিফ আল উছমানিয়্যাহ।

দায়িত্ব পালনে বাঁধা সৃষ্টি করে।

খিলাফাহ কীভাবে গঠিত হয়? নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলোর দ্বারা খিলাফাহ গঠিত হয়ে থাকে-

বায়াহ প্রদানের মাধ্যমে।

অর্থাৎ আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ এর বায়াহ। আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ হলেন ওলামায় কেরাম ও মুসলিমদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ; বায়াহ প্রদানের সময়ে উরফ বা সামাজিকভাবে জ্ঞাত কোন কষ্ট ছাড়াই যাদের পক্ষে উপস্থিত থাকা সম্ভব। যেমন আবু বকর সিদ্দীক রা.কে সাহাবায় কেরামের বায়াহ প্রদান। আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ এর ক্ষেত্রেও কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন, তারা আদালাতসম্পন্ন হবেন। খলীফা হওয়ার শর্তসমূহ তাদের জানা থাকতে হবে। তাদের মাঝে মতামত পেশ করা ও তাদবীর বা পরিচালনার যোগ্যতা এবং হিকমাহ থাকতে হবে।

আপনি যদি বর্তমানে উম্মাহর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ সন্ধান করেন তাহলে আপনি দেখবেন, মুজাহিদ ও মুজাহিদ আলেমগণই হলেন এ যামানার আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ। পক্ষান্তরে যারা তাগুতদের শাসনের অধীনে বসবাস করছে তাদের পক্ষে আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ হওয়া সম্ভব নয়।

ওলায়াতুল আহদ বা ইস্তিখলাফের মাধ্যমে। এর অর্থ হলো, খলীফা তার পরবর্তী সময়ের জন্য এমন কাউকে খলীফা নির্ধারণ করে দিবেন, যাকে খলীফা বানানো শুদ্ধ। যেমন আবু বকর রা. ওমর রা.কে খলীফা বানিয়ে গিয়েছিলেন।

শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে। ইমাম আহমাদ রহ. বলেছেন,

وَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً وَسُمِّي أَمِير الْمُؤْمِنِينَ فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَبِيتُ وَلَا يَرَاهُ إِمَامًا بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا.

"যদি কেউ মুসলিমদের ওপর তরবারি চালিয়ে জয়ী হয়ে যায় এবং একপর্যায়ে খলীফা বনে যায় এবং তাকে আমীরুল মু'মিনীন নামকরণ করা হয় তাহলে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এমন কোন ব্যক্তির

জন্য তাকে ইমাম না মেনে এক রাত অতিবাহিত করাও বৈধ হবে না, সে (খলীফা) নেককার হোক বা পাপাচারী।" লাওয়ামি'উল আনওয়ার আল বাহিয়্যাহ[১]- ৪২৩ পৃ.।

ইমামের কিছু দায়িত্ব-

১- কোরআন-সুন্নাহর দ্বারা প্রমাণিত দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে দ্বীনের হেফাজত করা এবং ইসলামের শা'আয়ের[২] বা নিদর্শনসমূহ কায়েম করা।

২- মুসলিমদের দ্বীন-দুনিয়ার প্রয়োজন পুরণের দায়িত্ব গ্রহণ করা।

৩- জিহাদ পরিচালনা করা এবং মুসলিমদের সীমানা রক্ষা করা।

ইমামকে বায়াহ দেওয়া ওয়াজিব- নবী সা. এর একটি হাদীসে আছে,

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

"যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে নিজের হাত গুটিয়ে নেবে সে কেয়ামতের দিন আল্লাহর সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, (এ ব্যাপারে) তার কোন দলীল নেই। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা যাবে যে, তার স্কন্ধে কোন বায়াহ নেই তার জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু হবে।" সহীহ মুসলিম- **১৮৫১**

ইমামকে বায়াহ প্রদানের ভাষা- উবাদা ইবনে সামেত রা. এর হাদীসে এসেছে যে, তিনি বলেন,

دَعَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ.

নবী সা. আমাদেরকে ডাকলেন। আমরা তাকে বায়াহ দিলাম। তখন তিনি আমাদের মাঝে যেসব শর্ত আরোপ করলেন তার মধ্যে তিনি বললেন, "আমরা আমাদের পছন্দ ও অপছন্দের সময়ে, সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার

---

[১] প্রকা. মু'আসসাতুল খাফিক্বীন।

[২] শা'আয়ের কায়েম দ্বারা উদ্দেশ্য হজ্ব পালনের বন্দোবস্ত করা এবং বাহ্যিক ইবাদাতগুলোর ব্যবস্থাপনা করা। আল্লাহ ভালো জানেন।

সময়ে এবং আমাদের ওপর তাকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁর কথা শোনা ও মানার ব্যাপারে বায়াহ দিলাম। এবং এই মর্মেও বায়াহ দিলাম যে, আমরা ক্ষমতার যোগ্য ব্যক্তির সঙ্গে ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব করব না। (রাসুল সা. তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন) "তবে যদি তোমরা এমন স্পষ্ট কুফরী দেখতে পাও, যে ব্যাপারে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে।" সহীহ বুখারী- ৬৬৪৭

ইমামের আনুগত্য করা ওয়াজিব

সমগ্র উম্মাহ এই ব্যাপারে একমত যে, ইমামের কথা শোনা ও মান্য করা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে দলীল হলো, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيۡعُوا الرَّسُوۡلَ وَ اُولِی الۡاَمۡرِ مِنۡكُمۡ.

{হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসুলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের।} আন নিসা- ৫৯। এ ব্যাপারেও একমত যে, ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম এবং তাঁর সঙ্গে ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্বকারী ব্যক্তিকে হত্যা করা ওয়াজিব। নিম্নোক্ত হাদীসটি এ ব্যাপারে দলীল,

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ.

"যে ব্যক্তি কোন ইমামকে বায়াহ দিলো, এবং তাকে সে দৃঢ়চিত্তে অঙ্গিকার প্রদান করল সে যেন সাধ্যমতো তার আনুগত্য করে। তথাপিও যদি কেউ এসে ইমামের সঙ্গে ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব করে, তাহলে তোমরা তার গর্দান উড়িয়ে দাও।" সহীহ মুসলিম- ১৮৪৪

বিদ'আত

ইমাম শাতিবী রহ. বিদ'আতকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন যে,

طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغةُ في التعبد لله تعالى.

'বিদ'আত হলো দ্বীনের মধ্যে নব উদ্ভাবিত কোন পদ্ধতি, যা শরীয়াহর সঙ্গে মিল রাখে, যা করার পেছনে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত 'আরো ভালোভাবে করা' উদ্দেশ্য হয়ে থাকে'। আল ই'তিসাম[১]- ১/৫০। আর শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বিদ'আতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন,

هي ما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب.

'বিদ'আত এমন একটি আমল, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল নির্ধারণ করেননি এবং রাসুল সা.ও উক্ত আমলকে ওয়াজিব বা মুস্তাহাব হিসেবেও পালন করতে বলেননি'। মাজমু'উল ফাতাওয়া[২]- ৪/১০৮

সুতরাং বিদ'আত হলো এমন প্রতিটি আমল, যার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, অথচ তা ইসলামী শরীয়াহর অন্তর্ভূক্ত নয়।

বিদ'আতের একটি নজীর

جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَقَالَ (أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

তিন ব্যক্তি রসুলুল্লাহ সা. এর নিকটে এসে তাঁর ইবাদাত সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তাদের কাছে যেন রাসুলের ইবাদাত কম মনে হলো। তাই তারা এই ইবাদাতগুলো এমন পদ্ধতিতে করতে চাইলেন, যা রাসুলের সুন্নাহপরিপন্থী। তাদের একজন বলে উঠলেন, আমি তো সারা রাতই

---

[১] প্রকা. দারে ইবনে আফফান।

[২] প্রকা. মুজাম্মা'উল মালিক ফাহ্দ।

সালাত আদায় করব। আরেকজন বলে উঠলেন, আমি তো সারা জীবনই সিয়াম রাখব; কখনোই সিয়াম ছাড়া থাকব না। আরেকজন বলে উঠলেন, আমি নারীসঙ্গ পরিহার করব; আর কখনোই বিবাহ করব না। তখন রাসুল সা. তাদের নিকট এসে তাদেরকে বললেন, "তোমরাই কি এই কথাগুলো বলেছ? আল্লাহর কসম! মনে রাখবে, আমি তোমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু ও তাকওয়াবান। তবুও আমি সিয়াম রাখি আবার সিয়াম ছাড়াও থাকি। আমি (রাতে) সালাত আদায় করি আবার ঘুমাইও এবং আমি বিবাহ-শাদীও করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে আমার অন্তর্ভূক্ত নয়।" সহীহ বুখারী- ৪৭৭৬

বিদ'আতের হুকুম

আহলুল ইলম এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, ইবাদাত ও আক্বীদার ক্ষেত্রে বিদ'আত করা হারাম। কিছু কিছু বিদ'আত রয়েছে যা কুফরের পর্যায়ের। অর্থাৎ যদি কোন বিদ'আত শিরকের মতো ইসলাম ভঙ্গকারী কোন বিষয়ে পতিত হওয়ার মতো অবস্থায় মানুষকে নিয়ে যায়। বিদ'আত হারাম হওয়ার ব্যাপারে একটি দলীল হলো, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِیۡ مُسۡتَقِیۡمًا فَاتَّبِعُوۡهُ ۚ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمۡ عَنۡ سَبِیۡلِهٖ ؕ ذٰلِکُمۡ وَصّٰکُمۡ بِهٖ لَعَلَّکُمۡ تَتَّقُوۡنَ.

{আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ করো এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো।} আল আন'আম- ১৫৩। নবী সা. এর একটি হাদীসও এক্ষেত্রে দলীল। তিনি বলেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ.

"যে আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন কোন নতুন বিষয় সংযুক্ত করবে যা তাতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।" সহীহ বুখারী- ২৫৫০

বিদ'আত কীভাবে কীভাবে হয়ে থাকে?

দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত প্রবেশ করার অনেক দরজা রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো-

১- আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার দ্বীনের মধ্যে এমন কোন ইবাদাত তৈরি করা, যা নবী সা. আমাদের মাঝে নিয়ে আসেননি। রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, "যে আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন কোন নতুন বিষয় সংযুক্ত করবে যা তাতে নেই, তা রদ বলে গণ্য হবে।" অর্থাৎ প্রত্যাখ্যাত ও অগ্রহণযোগ্য হবে। তো যে ব্যক্তি এমন কোন ইবাদাত তৈরি করবে যা আল্লাহর রাসুল সা. করেননি কেমন যেন সে এই দাবি করছে যে, সে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে এমন কিছু জানে যা রসুলুল্লাহ সা. জানতেন না। অথচ রাসুল সা. এমন হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

২- সুনির্দিষ্ট কোন ইবাদাতকে এমন কোন নির্দিষ্ট সময়, স্থান বা নির্দিষ্ট পদ্ধতির সঙ্গে খাস করা, শরীয়াহ যেটিকে এভাবে খাস করেনি। যেমন কেউ সিয়াম রাখার জন্য নির্দিষ্ট কিছু দিবসকে খাস করল। কিংবা সালাত আদায় করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু রাতকে খাস করল। কিংবা বিশেষ কিছু উপলক্ষ্যে কোরআনের বিশেষ কিছু আয়াতকে তেলাওয়াতের জন্য খাস করল। অথবা নির্দিষ্ট কিছু সময় বা নির্দিষ্ট কিছু স্থানে সুনির্দিষ্ট কোন বারাকাহ আছে বলে আক্বীদা রাখল।

আমর ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আমর ইবনে সালামাহ আল হামদানী হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার বাবা (ইয়াহইয়া) আমার নিকট বর্ণনা করে বলেন, আমার বাবা (আমর) আমার নিকট বর্ণনা করে বলেন,

كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَإِذَا خَرَجَ، مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رضي الله عنه فَقَالَ: أَخَرَجَ إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قُلْنَا: لَا بَعْدُ. فَجَلَسَ مَعَنَا حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ، قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ آنِفًا أَمْرًا أَنْكَرْتُهُ وَلَمْ أَرَ – وَالْحَمْدُ لِلَّهِ – إِلَّا خَيْرًا. قَالَ: فَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: إِنْ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ. قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَوْمًا حِلَقًا جُلُوسًا يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ، وَفِي أَيْدِيهِمْ حصًا، فَيَقُولُ: كَبِّرُوا مِائَةً، فَيُكَبِّرُونَ مِائَةً،

فَيَقُولُ: هَلِّلُوا مِائَةً، فَيُهَلِّلُونَ مِائَةً، وَيَقُولُ: سَبِّحُوا مِائَةً، فَيُسَبِّحُونَ مِائَةً، قَالَ: فَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئًا انْتِظَارَ رَأْيِكَ أَوِ انْتظارَ أَمْرِكَ. قَالَ: «أَفَلَا أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعُدُّوا سَيِّئَاتِهِمْ، وَضَمِنْتَ لَهُمْ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ»، ثُمَّ مَضَى وَمَضَيْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَى حَلْقَةً مِنْ تِلْكَ الْحِلَقِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «مَا هَذَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ؟» قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حصًا نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ. قَالَ: «فَعُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ، فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم مُتَوَافِرُونَ، وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ، وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَوْ مُفْتَتِحُو بَابِ ضَلَالَةٍ». قَالُوا: وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ. قَالَ: «وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَنَا أَنَّ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ "، وَايْمُ اللَّهِ مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ.» ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ. فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ: رَأَيْنَا عَامَّةَ أُولَئِكَ الْحِلَقِ يُطَاعِنُونَا يَوْمَ النَّهْرَوَانِ مَعَ الْخَوَارِجِ.

“আমরা ফজরের সালাতের পূর্বেই আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর বাড়ির দরজায় গিয়ে বসে থাকতাম। যখন তিনি মসজিদে যাওয়ার জন্য বাহির হতেন, তখন আমরা তাঁর সাথে সাথে যেতাম। একদিন আবু মুসা আল আশ’আরী রা. এসে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আবু আব্দুর রহমান (আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ) কি এখনো বের হয়েছেন? আমরা বললাম, না, বের হননি। তখন তিনিও আমাদের সাথে বসে পড়লেন। যখন তিনি বের হলেন তখন আমরা সবাই উঠে তাঁর কাছে গেলাম। আবু মুসা আশ’আরী রা. তাকে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ) আমি একটু আগে মসজিদের মধ্যে একটি বিষয় দেখেছি এবং আমার কাছে বিষয়টি নতুন মনে হয়েছে, যদিও যা দেখেছি তা ভালো ছাড়া খারাপ মনে হয়নি, আলহামদুলিল্লাহ।

ইবনে মাসউদ বললেন, বিষয়টি কী? আবু মুসা বললেন, আপনি জীবিত থাকলে, একটু পরেই তা দেখতে পাবেন। তিনি বলেন, আমি দেখলাম কিছু মানুষ কয়েকটি হালাকায় (বৃত্তাকারে) বসে সালাতের অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক হালাকায় (গ্রুপে) একজন (নেতা গোছের) ব্যক্তি রয়েছে। তাদের

প্রত্যেকের হাতে নুড়ি পাথর রয়েছে। (নেতা গোছের) লোকটি বলছে, সবাই একশতবার 'আল্লাহু আকবার' পড়ুন। তখন সবাই ১০০ বার 'আল্লাহ আকবার' বলছে। সে আবার বলছে, সবাই ১০০ বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ুন। এতে সবাই ১০০ বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলছে। সে আবার বলছে, সবাই ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ' বলুন। সবাই তখন ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ' বলছে। ইবনে মাসউদ রা. বললেন, আপনি তাদেরকে কী বলেছেন? তিনি বললেন, আমি আপনার মতামত ও নির্দেশের অপেক্ষায় তাদেরকে কিছু বলিনি।

ইবনু মাসউদ রা. বললেন, আপনি তাদেরকে কেন বললেন না যে, তোমরা তোমাদের গুনাহগুলো গুণে গুণে রাখো। আর আপনি এই দায়িত্বও নিতেন যে, তাদের কোনো নেক আমল নষ্ট হবে না? এরপর আমরা সবাই তাঁর সঙ্গে মসজিদে গেলাম। তিনি ঐ হালকাগুলোর (গ্রুপগুলোর) একটি হালাকার নিকট গিয়ে তাদেরকে বললেন, আমি তোমাদেরকে এ কী করতে দেখছি? তারা বলল, হে আবু আব্দুর রহমান (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ)! আমরা নুড়ি পাথর দিয়ে তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর গণনা করছি। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের গুনাহগুলো গণনা করো। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি যে, তোমাদের কোন নেক আমল বিনষ্ট হবে না। হতভাগা উম্মতে মুহাম্মাদী! কত দ্রুত তোমরা ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছ! এখনো তোমাদের মাঝে তোমাদের নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ বিপুল সংখ্যায় জীবিত রয়েছেন। দেখো! তাঁর পোশাকগুলি এখনো পুরাতন হয়নি, তাঁর পাত্রগুলো এখনো ভেঙ্গে নষ্ট হয়নি। আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমরা হয় মুহাম্মাদ সা. এর দ্বীনের চেয়েও ভালো কোনো দ্বীনের ওপরে আছো নয়তো তোমরা কোন গোমরাহীর দরজা খুলতে যাচ্ছো।

লোকেরা বলে উঠল, হে আবু আব্দুর রহমান (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ)! আমাদের উদ্দেশ্য তো ভালোই। (জবাবে) তিনি বললেন, অনেক মানুষেরই উদ্দেশ্য ভালো হয়, কিন্তু সেই ভালো সে লাভ করতে পারে না। রসুলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন যে, 'কিছু মানুষ

কুরআন তেলাওয়াত করবে, কিন্তু তাদের তেলাওয়াত কণ্ঠনালীর নিচে নামবে না। আল্লাহর কসম! আমি জানি না, হয়ত তোমাদের অনেকেই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এরপর তিনি তাদের কাছ থেকে চলে গেলেন। (বর্ণনাকারী) আমর ইবনে সালামাহ বলেন, এ সকল হালাকায় যারা উপস্থিত ছিলো তাদের অধিকাংশকেই দেখেছি নাহরাওয়ানের যুদ্ধে খারেজীদের পক্ষ নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।" মুসনাদে দারেমী[১]- ২১১

৩- আহলুল ইলমের মধ্য হতে ফাজায়েলে আমলের ক্ষেত্রে যারা যয়িফ হাদীসের ওপর আমল করেন তাদের যয়িফ হাদীসের ওপর আমল করার শর্তগুলোর প্রতি খেয়াল না রাখা। এতে করে আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে নতুন নতুন ইবাদাত তৈরি হয়। যয়িফ হাদীসের ওপর আমল কীভাবে করতে হবে সে সংক্রান্ত নিয়মগুলো বোঝা ও সেগুলো মেনে চলা উচিত।

একটি ভুল ধারণা-

কিছু মানুষ মনে করে যে, বিদ'আতে হাসানাহ বলতেও দ্বীনের মধ্যে কিছু আছে। অথচ এটি একটি বাতিল ধারণা। কারণ ইবাদাতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, ইবাদাত কোরআন-সুন্নাহর বক্তব্যের ওপর নির্ভরশীল। কোন ব্যক্তির জন্য ইজতিহাদ করে এমন কিছু তৈরি করা জায়েজ হবে না, যে ব্যাপারে কোন দলীল নেই। কারণ রসুলুল্লাহ সা. তাঁর এক খুতবায় বলেছেন,

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ. وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ কথা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। সর্বেশষ্ঠ আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মাদ (সা.) এর আদর্শ। সবচেয়ে খারাপ জিনিস হচ্ছে (দ্বীনের মধ্যে) নব উদ্ভাবিত জিনিস। আর প্রতিটি বিদ'আতই একেকটি গোমরাহী।" সহীহ মুসলিম- ৮৬৭। তাদের অনেকের দলীল হলো নিম্নোক্ত হাদীসটি- مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً "যে ব্যক্তি ইসলামের ভিতরে উত্তম কোনো সুন্নাহ চালু করল..." সহীহ মুসলিম- ১০১৭। অথবা ওমর রা. এর একটি উক্তি দিয়েও

[১] মুহাক্কিক বলেন, এর সনদ জায়্যিদ। প্রকা. দারুল মুগনী।

তারা প্রমাণ করতে চায়। তিনি বলেন, نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ ‘এটি কতই উত্তম বিদ’আত (নতুন আমল)।’ সহীহ বুখারী- **১৯০৬**। অথচ এটি দলীল পেশ করার একটি ভুল পদ্ধতি। কেননা এই দুইটি হাদীস এমন আমলের ব্যাপারে এসেছে যা মূলত কোন বিদ’আতই নয়। বরং তা এমন (মৃত) সুন্নাহ যা পুনর্জীবিত করা হয়েছে।

সমাজে প্রচলিত কিছু বিদ’আত-

শবে বরাতের রাত উদযাপন করার বিদ’আত। সফর মাসে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকা[১]। ঈদে মীলাদুন্নবী সা. পালন করা। কোরাস কণ্ঠে নির্দিষ্ট একটি পন্থায় মাথা ও শরীর দুলিয়ে যিকির করা। মাইয়েতের রূহের জন্য কিংবা বিবাহ পড়ানোর সময়ে সুরা ফাতিহা পাঠ করা। জোরে জোরে সালাতের নিয়ত করা। শোক সংবাদ ঘোষণা করা, ইত্যাদি।

বিদ’আতীদের সম্পর্কে কিছু মাসআলা-

১- তাদের পেছনে সালাত আদায় করার বিধান কী? যদি তার বিদ’আতটি কুফরী হয় (বিদ’আতে মুকাফফিরাহ) তাহলে সবার মতে তার পেছনে সালাত আদায় করা জায়েজ নেই। পক্ষান্তরে যদি তার বিদ’আতটি মুকাফফিরাহ না হয় তাহলে তার পেছনে সালাত আদায় করা মাকরূহ। তবুও যদি কেউ সালাত আদায় করে তাহলে আশা করা যায় তার সালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। যে প্রকাশ্যে মুকাফফিরাহ নয় এমন বিদ’আতী কাজ করে তার পেছনে সালাতেরও এই বিধান।

২- বিদ’আতীর সাক্ষ্য কি গ্রহণযোগ্য হবে? যদি বিদ’আতে মুকাফফিরাহ হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমেই তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তবে মুকাফফিরাহ না হলেও অধিকাংশ আহলুল ইলমের মত হলো তার সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হবে না। কারণ আল্লাহ তা’আলা বলেছেন,

وَّ اَشۡهِدُوۡا ذَوَیۡ عَدۡلٍ مِّنۡکُمۡ.

{আর তোমরা তোমাদের মধ্য হতে ন্যায়পরায়ণ দুইজন ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাও} আত ত্বলাক- ০২

---

[১] আরবের কোথাও কোথাও এই বিদ’আতের প্রচলন রয়েছে।

৩- বিদ’আতী ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের আচরণ কেমন হবে? যদি তার ব্যাপারে এই আশা করা যায় যে, সে বিদ’আত থেকে ফিরে আসবে এবং তাওবা করবে তাহলে তাকে নাসিহা করা হবে এবং সঠিক পথ বাতলে দেওয়া হবে। কিন্তু যদি এমন না হয় তাহলে তাকে বয়কট করা হবে যদি বয়কটে কল্যাণ (মাসলাহা) থাকে।

বিদ’আতের অনেক সুরত রয়েছে। একজন মানুষের এটা জানা থাকা দরকার যে, যখনই কোন বিদ’আত চালু হয় তখনই রাসুল সা. এর কোন একটি সুন্নাহ পরিত্যাক্ত হয়। বিদ’আতের একটি ভয়াবহতা হলো, বিদ’আতের মাধ্যমে আল্লাহ তা’আলার নিম্নোক্ত আয়াতকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

{আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নি’আমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।} আল মায়িদা- ০৩

বিভিন্ন ফের্কা ও মতাদর্শ

প্রিয় মুসলিম ভাই! আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা আমাদেরকে কোরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে এবং বিচ্ছিন্ন না হতে আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا.

{তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধরো; বিচ্ছিন্ন হয়ো না।} আলে ইমরান- ১০৩। রাসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"আমি তোমাদেরকে তাকওয়া এবং শোনা ও আনুগত্য করার আদেশ দিচ্ছি, যদিও সে (আমীর) একজন হাবশী গোলাম হয়। কারণ তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে তারা অচিরেই প্রচুর মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাহ এবং আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাহগণের সুন্নাহ অনুসরণ করবে। তা মাঢ়ীর দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে। সাবধান! (দ্বীনের মধ্যে) প্রতিটি নব আবিষ্কার বিষয় সম্পর্কে! কারণ (দ্বীনের মধ্যে) প্রতিটি নব আবিষ্কার বিষয় হলো বিদ'আত এবং প্রতিটি বিদ'আত হলো গোমরাহী।" **মুসনাদে আহমাদ[১]- ১৭১৪৫। ইবনে রজব হাম্বলী রহ. বলেন,**

وهذا موافق لما روي عنه من افتراقِ أُمَّته على بضعٍ وسبعين فرقة، وأنها كلّها في النَّار إلَّا فرقة واحدة، وهي من كان على ما هو عليه وأصحابُه، وكذلك في هذا الحديث أمر عندَ الافتراق والاختلاف بالتمسُّك بسنته وسنةِ الخلفاء الرَّاشدين من بعده، والسنة: هي الطريقة المسلوكةُ، فيشمل ذلك التمسُّك بما كان عليه هو وخلفاؤه الرَّاشدونَ مِنَ الاعتقاداتِ والأعمالِ والأقوال، وهذه هي السنةُ الكاملةُ.

'অনেক মত পার্থক্য দেখা যাওয়ার বিষয়টি রাসুলের ঐ হাদীসের সঙ্গে মিলে যায়, যেখানে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর উম্মাহ ৭০ এর অধিক

---

[১] মুহাক্কিক হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। প্রকা. মু'আসসাতুর রিসালাহ।

দলে বিভক্ত হবে এবং একটি দল বাদে সব দলই জাহান্নামে যাবে। আর সেই দলটির পরিচয় হলো, রাসুল ও সাহাবীগণ যে আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ঐ দলটিও ঐ আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এ কারণেই উক্ত হাদীসে রসুলুল্লাহ সা. মত পার্থক্য ও বিচ্ছিন্নতার সময়ে তাঁর সুন্নাহ ও খোলাফায় রাশেদীনের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার আদেশ করেছেন। আর সুন্নাহ হলো ঐ রাস্তা যার ওপর চলা হয়। তাই এখানে আঁকড়ে ধরা বলতে, নবী সা. ও খোলাফায় রাশেদীন যেসব আক্বীদা, কথা ও কাজের ওপর অটল ছিলেন সে সব কিছুই আঁকড়ে ধরা বোঝায়। এটিই পরিপূর্ণ সুন্নাহ।' জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম[1]- ২/১২০ তিনি অন্যত্র বলেন,

والخلفاء الراشدون الذين أمِرْنا بالاقتداء بهم هم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ رضي الله عنهم.

'আমাদেরকে যেসকল খোলাফায় রাশেদীনের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে তারা হলেন, আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম।' জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম[2]- ২/৭৭৫

অতএব আমরা এখন সংক্ষেপে প্রচলিত বিভিন্ন ফের্কা ও মতাদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করব, যাতে একজন মুসলিম ভাই এই ফের্কাগুলোর হাকীকত বুঝতে পারেন এবং তিনিও যাতে তাদের সঙ্গে তাদের প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসিয়ে না দেন।

রাফেজী

এই ফের্কার লোকদের রাফেজী (পরিত্যাগকারী) বলার কারণ হলো, যায়দ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালেবকে তারা রাফজ বা পরিত্যাগ করেছিল। তারা যায়দ ইবনে আলী রহ.কে আবু বকর ও ওমর রা. সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি তাদের উভয়ের প্রশংসা করেন এবং বলেন, তারা দু'জন আমার নানার উজীর বা সাহায্যকারী ছিলেন। এ কথা শুনে তারা তাকে পরিত্যাগ করে তার কাছ থেকে চলে আসে।

---

[1] প্রকা. মু'আসসাতুর রিসালাহ।

[2] প্রকা. দারুল ইসলাম।

রাফেজীদের কিছু আক্বীদা হলো, তারা নবী সা. এর বংশের লোকদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করে। তারা আলী রা.কে সকল সাহাবীর ওপর প্রাধান্য দেয় এবং তাকে রব মনে করে। তাদের মধ্যে কেউ আলী রা.কে নবী সা. এর ওপরও প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তারা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা.কে গালিগালাজ করে। তারা বিশ্বাস করে যে, কোরআন ত্রুটিপূর্ণ, (নাউযুবিল্লাহ)। তারা গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তারা গায়রুল্লাহর জন্য মানত করে এবং গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রাণী জবাই করে। এও জেনে রাখতে হবে যে, তাদের ধর্মের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাকিয়্যা। এর অর্থ হলো, তারা নিজেদের ধর্মের অনেক কিছু গোপন করে রাখে। তাদেরকে শীয়াও (গোষ্ঠী) বলা হয়। যেহেতু তারা রাসুল সা. এর পরিবারকেন্দ্রিক একটা 'গোষ্ঠী' গঠন করেছে।

রাফেজীদের হুকুম-

এই যামানায় রাফেজীরা হলো কাফের ও মুরতাদ। তাদের কুফরী সুস্পষ্ট। কারণ তারা শিরকে পতিত হয় এবং আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার কালামকে মিথ্যা মনে করে।

তাদের একটি গ্রুপের নাম হলো নুসাইরী। তারা এক বাতেনী (গোপন) ফের্কা। তৃতীয় শতাব্দীতে তাদের উত্থান। নুসাইরীদেরকে কট্টর শিয়া গণ্য করা হয়। তাদের দাবী হলো, আলী রা. এর মাঝে নাকি মা'বুদী সত্তার উপস্থিতি রয়েছে। এটাকে পুঁজি করে তারা আলী রা.কে মা'বুদ বানিয়ে ফেলেছে। তাদের উদ্দেশ্য, ইসলামকে ধ্বংস করা। ইসলামের 'হাতল' ভেঙ্গে দেয়া। মুসলিমদের ভূমির বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনাকারী এমন সবার সঙ্গেই তাদেরকে পাওয়া যায়। শামের ফরাসী উপনিবেশবাদীরা তাদেরকে আলাবী (আলী রা. এর অনুসারী) লকব দিয়েছিল। উদ্দেশ্য, তাদের বাতেনী রাফেজী আক্বীদার হাকীকত যাতে ঢাকা পড়ে যায়।

ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন,

هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى؛ بل وأكفر من كثير من المشركين. وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم

أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم... وهم دائما مع كل عدو للمسلمين. (باختصار)

‘নুসাইরী নামক এই সম্প্রদায়সহ বাতেনী কারামিতাদের সকল শ্রেণী ইহুদী-খৃষ্টানের চেয়েও বড় কাফের। বরং অনেক মুশরিকের চেয়েও বড় কাফের তারা। তাতারী ও ফ্রাঙ্কস্‌সহ অন্যান্য যুদ্ধরত কাফেরদের চেয়েও এদের ক্ষতির দিক অনেক ভয়াবহ।... সব সময়ে তারা মুসলিমদের সকল শত্রুর পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে।’ মাজমুউ’ল ফাতাওয়া[১]- ৩৫/১৫০ (সংক্ষেপিত)।

সুফীবাদ

তাসাউফ বা সুফিবাদ এমন একটি ফের্কা, যা মানুষের ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকার প্রতিবাদস্বরূপ হিজরী তৃতীয় শতকে ইসলামী বিশ্বে ব্যক্তিগত প্রবণতার মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। যা একজন ব্যক্তিকে দুনিয়াবিমুখ হতে এবং খুব বেশি পরিমাণে ইবাদাত করতে উদ্বুদ্ধ করত। এক পর্যায়ে সেই ব্যক্তিগত প্রবণতা সুফীয়্যাহ صوفية নাম ধারণ করে প্রসিদ্ধ কিছু তরীকায় রূপ নেয়। একজন সুফী ব্যক্তি কোরআন-সুন্নাহ বিবর্জিত পন্থায় আল্লাহ তা’আলার মা’রেফত হাসিলে কাজ করে যায়। এ কারণেই তারা সুফীবাদের পথে চলতে গিয়ে এক সময়ে এক পাশে ঝুঁকে যায় এবং তাদের তরীকার সঙ্গে মূর্তিপুজারী ও পারস্যদের দর্শন এবং হিন্দুস্তানী ও গ্রিক দর্শন মিশ্রিত হয়ে যায়। একটি বিষয় খেয়াল রাখা জরুরী। আর তা হলো, যুহদ (زهد) আর তাসাউফ (تصوف) এর অর্থের মাঝে মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো, যুহদ বা দুনিয়াবিমুখ হতে শরীয়াহ আপনাকে নির্দেশ দিয়েছে। পক্ষান্তরে তাসাউফ হলো সত্যের পথ থেকে দূরবর্তী একটি মতবাদ, যে সত্যের পথে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা’আহ চলে এসেছে। কারণ সুফীদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা বিদ’আতে মুকাফফিরাহতে পতিত হয়। যেমন কবরপূজারীদের

[১] প্রকা. মুজাম্মা’উল মালিক ফাহদ

অবস্থা, যারা গায়রুল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। অথচ এটা বড় শিরক। তাদের একটি উক্তি হলো,

إذا ضاقت عليكم الأمور عليكم بأصحاب القبور.

'যখন তোমাদের জন্য বিভিন্ন সমস্যা কঠিন আকার ধারণ করবে তখন তোমরা কবরবাসীদেরকে আঁকড়ে ধরবে।' তারা বিশ্বাস করে যে, কবরবাসীরা উপকার বা ক্ষতি সাধন করতে পারে। তারা মৃত ব্যক্তিদের নামে কসম খায়। মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে মান্নত করে এবং তাদের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করে। তবে সুফীদের মধ্যে কেউ কেউ আছে কেবল পথভ্রষ্ট। তাদের সংখ্যা অল্প। তারা অবশ্য শিরক থেকে বেঁচে থাকে। তারা এমন কিছু বিদ'আত পালন করে যা শিরকের পর্যায়ে পৌঁছয় না।

নিম্নে সুফী আলেমদের কিছু উক্তি দেওয়া হলো-

বায়জিদ বোস্তামি বলেছে,

سبحاني ما أعظم شأني!

'আমি কতই না পবিত্র! আমার শান কতই না মহান!' মাসরাউত তাসাউফ[১]- ২/২৬০

ইবনে আরাবী বলেছে,

فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده.

'তখন তিনি আমার প্রশংসা করেন আর আমিও তাঁর প্রশংসা করি। তিনি আমার ইবাদাত করেন আর আমিও তাঁর ইবাদাত করি।' হাযিহী হিয়াস সুফিয়্যাহ[২] পৃ. ৪৩।

এসমস্ত কারণেই সালাফে সালেহীনগণ রহ. মূর্তিপূজা আর নাস্তিকতার সঙ্গে তাসাউফ মিশ্রিত হওয়ার আগে থেকেই তাসাউফকে তারা খারাপ বলে আসছেন। শাফেয়ী রহ. বলেন,

لو أن رجلا تصوف أول النهار لا يأتي الظهر حتى يصير أحمقا.

---

[১] প্রকা. আব্বাস আহমাদ আল বায, মক্কা মুকাররমাহ।

[২] প্রকা. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।

'যদি কোন ব্যক্তি দিনের শুরুতে তাসাউফ চর্চা শুরু করে তাহলে যোহর আসতে না আসতেই সে আহাম্মকে পরিণত হবে।' তিনি আরো বলেন,

ما لزم أحد الصوفية أربعين يوما فعاد عقله إليه أبدا.

'কেউ চল্লিশ দিন যাবত তাসাউফ নিয়ে পড়ে ছিলো আর পরবর্তীতে তার বিবেক-বুদ্ধি তার কাছে আবার ফিরে এসেছে এমনটি হয়নি।' তালবিসে ইবলিস[১]- ৩২৭। তিনি আরো বলেন,

خلّفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن.

'বাগদাদে আমি এমন কিছু দেখে এসেছি, যা যিন্দিকরা তৈরি করেছে। তারা এর নাম দিয়েছে তাগবীর। এর মাধ্যমে তারা মানুষদেরকে কোরআন থেকে বাঁধা দেয়।' আল ইস্তিকামাহ[২]- ১/২৩৭

জাহমিয়্যাহ

জাহমিয়্যাহ মূলত জাহম ইবনে সফওয়ানের অনুসারীদেরকে বলা হয়। এই জাহম ইবনে সফওয়ান জা'দ ইবনে দিরহামের কাছ থেকে তা'তীল تعطيل এর শিক্ষা লাভ করেছে। ১২৮ হিজরী সনে খোরাসানে জাহম ইবনে সফওয়ানকে হত্যা করা হয়। আল্লাহর যাবতীয় সিফতের ক্ষেত্রে তাদের মাযহাব হলো ইনকার বা এগুলোকে অস্বীকার করা। তবে কট্টরপন্থী জাহমিয়্যাহরা আল্লাহর নামগুলোও অস্বীকার করে। এজন্যই তাদের নাম হয়েছে মুয়াত্তিলাহ। বান্দার কাজ-কর্মের ব্যাপারে তাদের মাযহাব হলো, বান্দা তার কাজ-কর্মের ব্যাপারে মজবুর বা বাধ্য। এক্ষেত্রে কোন বান্দার নিজ কাজ-কর্মের ব্যাপারে তার কোন সক্ষমতা ও এখতিয়ার নেই। এ কারণে তাদেরকে জাবরিয়্যাহও বলা হয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তির ভয় এবং ঈমান ও দ্বীন এই নামগুলোর ব্যাপারে তাদের মাযহাব হলো, কবীরা গুনাহকারী ব্যক্তি একজন কামেল মু'মিন; সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। একারণে তাদেরকে মুরজিয়াও বলা হয়। তো দেখা যাচ্ছে তারা তিন জীম (جيم) এর অধিকারী। تجهم، جبرية، إرجاء বা জাহমিয়্যাহ,

---

[১] প্রকা. দারুল ফিকর।

[২] প্রকা. জামিয়াতুল ইমাম।

জাবরিয়্যাহ ও মুরজিয়া। আমাদের এই যুগেও এমন কিছু লোক আত্মপ্রকাশ করেছে যারা এ জাতীয় কিছু কিছু আক্বীদা লালন করে আবার নিজেদেরকে আহলুস সুন্নাহ বলেও দাবি করে।

মু'তাযিলা

ওয়াসেল ইবনে আতা যখন নিজের বিদ'আতী মতবাদের প্রবক্তা হয় তখন সে হাসান বসরী রহ. এর মজলিসকে ই'তেযাল বা বর্জন করে নিজে একটি মজলিস কায়েম করে। এ অবস্থা দেখে হাসান বসরী রহ. বললেন, اعتزلنا واصل.

'ওয়াসিল আমাদেরকে ই'তেযাল বা বর্জন করেছে।' এই ঘটনার পরই মু'তাযিলারা প্রসিদ্ধি লাভ করে। মু'তাযিলারা তাদের সূচনালগ্নে দুইটি বিদ'আতী চিন্তাধারা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। ১- তারা এই কথা বলতে লাগল যে, একজন মানুষ পরিপূর্ণরূপে তার সকল কর্মে এখতিয়ারসম্পন্ন বা স্বাধীন। সুতরাং মানুষ নিজেই নিজের কর্ম সৃষ্টি করে। এই কারণেই তো তাকলীফের[১] বিষয়টি আমলের মাধ্যমে ধর্তব্য। ২- তারা এই মতও প্রচার করতে লাগল যে, কবীরা গুনাহকারী ব্যক্তি মু'মিনও নয় আবার কাফেরও নয়। বরং সে হলো ফাসেক। সুতরাং এভাবে তারা দুইটি মানযিলের মাঝে আরেকটি মানযিল নির্ধারণ করে। এটি হলো দুনিয়াতে তার হুকুম। পক্ষান্তরে আখেরাতে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কেননা সে জান্নাতীদের মতো আমল করেনি। বরং সে জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। তাদের মতে আবার এই ব্যক্তিকে মুসলিম বলতেও কোন বাঁধা নেই, যেহেতু সে বাহ্যিকভাবে ইসলাম পালন করে এবং কালিমায় শাহাদাহ উচ্চারণ করে। কিন্তু তাকে মু'মিন বলা যাবে না।

তাদের আরেকটি আক্বীদা হলো, কোরআন নাকি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার মাখলুক। তাদের এই আক্বীদা পোষণের কারণ হলো, তারা আল্লাহর কালাম বা কথা বলার সিফতকে অস্বীকার করে। এ কারণে তাদেরকে আল্লাহর সিফত অস্বীকারকারীদের মাঝেও গণ্য করা হয়।

---

[১] তাকলীফ অর্থ আল্লাহকর্তৃক বান্দার ওপর বিভিন্ন বিধান আরোপ করা।

তবে মু'তাযিলাদের গোমরাহীর মূল কারণ হলো, তারা তাদের আক্বীদার পক্ষে দলীল দিতে গিয়ে পুরোপুরি যুক্তির ওপর নির্ভর করে। বিভিন্ন জিনিসের বাস্তবতার জ্ঞানলাভ ও বিভিন্ন আক্বীদা উপলব্ধি করতে গিয়ে তারা যুক্তির ওপর নির্ভর করার কারণে যেসব ফলাফল দাঁড়িয়েছে সেগুলোর একটি হলো, একটি জিনিস ভালো নাকি মন্দ এই বিষয়টি তারা যুক্তি দিয়ে বিচার করে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ 'দারউ তা'আরুদিল আকলি ওয়ান নাকল' এ তাদের এই আক্বীদাকে খণ্ডন করেছেন। তিনি একটি একটি করে তাদের সমস্ত মত ও চিন্তাধারা খুঁজে খুঁজে বের করেছেন এবং সেগুলোর দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। তিনি এই বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে দেখিয়েছেন যে, আকলে সরীহ[১] কখনো সহীহ দলীলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় না।

আশ'আরী ফের্কা

আবুল হাসান আশ'আরীর নেসবতের[২] দিকে লক্ষ্য রেখে তার অনুসারীদেরকে আশ'আরী বলা হয়। আশ'আরীরা তাদের প্রতিপক্ষ মু'তাযিলা ও দার্শনিকসহ অন্যদের সঙ্গে তর্ক করার ক্ষেত্রে যুক্তি ও তর্কশাস্ত্রের বিভিন্ন দলীলকে তারা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। উদ্দেশ্য, ইবনে কুল্লাবের পদ্ধতি অনুসরণ করে দ্বীন-ইসলামের হাকীকত ও ইসলামী আক্বীদা প্রমাণ করা। এই মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা আবুল হাসান আশ'আরী তার জীবনে কয়েকটি অধ্যায় অতিক্রম করেছেন-

প্রথম অধ্যায়- এই অধ্যায়ে আবুল হাসান আশ'আরী তার সমকালীন মু'তাযিলাদের শায়খ আবু আলী আল জুব্বায়ীর সাহচর্যে থেকে তার কাছ থেকে তার যাবতীয় ইলম গ্রহণ করেছেন। এভাবে এক পর্যায়ে তার স্থলাভীষিক্ত বনে গেছেন এবং তার আস্থার জায়গায় পরিণত হয়েছেন

---

[১] আকলে সরীহ অর্থ হলো, এমন যুক্তি যা সংশয় ও প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত।

[২] এখানে নেসবত মানে হলো, নামের শেষে স্থান বা অন্য কিছুকে কেন্দ্র করে বাংলায় যে আমরা দীর্ঘ-ঈকার যোগে পরিচিতিমূলক বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করি। যেমন ফরিদপুরী, দেওয়ানবাগী, কুরায়শী, মালেকী, হাম্বলী ইত্যাদি। এই ব্যবহারটি মূলত আরবিতে প্রচলিত।

তিনি। আবুল হাসান আশ'আরী ৪০ বছর যাবত মু'তাযিলাদের নেতা ছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়- এ পর্যায়ে আবুল হাসান আশ'আরী মু'তাযিলাদের মাযহাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজেকে তাদের মতবাদ থেকে মুক্ত ঘোষণা করেন। তিনি নিজের জন্য এমন একটি নব্য মানহাজ তৈরি করেন, যে মানহাজে তিনি এমনভাবে কোরআন-সুন্নাহর বিভিন্ন বক্তব্য তা'বীল বা ব্যাখ্যা করবেন, যাতে সেগুলো তার ধারণা অনুযায়ী যুক্তি শাস্ত্রের নিয়ম-কানুনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রসিদ্ধ ৭টি সিফত অর্থাৎ, চিরঞ্জীব হওয়া, সব কিছু জানা, ইচ্ছা করা, সক্ষম হওয়া, শোনা, দেখা ও কথা বলা এগুলো যুক্তির আদলে প্রমাণ করার ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে কুল্লাবের তরীকা অনুসরণ করেন। আর সিফতে খবারিয়্যাহ অর্থাৎ চেহারা, দুইহাত, পা ও গোছা এগুলোকে তিনি এমনভাবে তা'বীল করেছেন যেন এগুলো তার ধারণা অনুযায়ী যুক্তিশাস্ত্রের নিয়ম-কানুনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এটাই হলো তার জীবনের ঐ অধ্যায় যার ওপর তার অনুসারীরা এখন পর্যন্ত অটল আছে।

তৃতীয় অধ্যায়- তার জীবনের এই পর্যায়ে এসে তিনি মৃত্যুর পূর্বে তার অনেক মত থেকে ফিরে এসেছিলেন। আবুল হাসান আশ'আরীর মৃত্যুর পর তার মাযহাবের ইমাম ও আশ'আরী মাযহাবের উসুল-আরকান প্রণেতাদের হাত ধরে এই মাযহাব আরো কয়েকটি ধাপ পার করে। এ সময়ে আশ'আরী মাযহাবের উসুল ও আকায়েদের ক্ষেত্রে তাদের ইমামদের বিভিন্ন ধরণের ইজতিহাদ ও মানহাজ তৈরি হয়। আশ'আরীদের নিকট দলীলের উৎস হলো, ইলমুল কালাম বা তর্কশাস্ত্রের কায়দা অনুযায়ী কোরআন-সুন্নাহ। একারণেই কোরআন-সুন্নাহর দলীল ও যুক্তি সাংঘর্ষিক হলে তারা যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ইমাম রাযী তার কিতাব 'আল ক্বানুন ও আসা-সুত তাকদীস' এ এবং ইমাম আমেদী ও ইবনে ফাওরাকসহ অন্যান্য আশ'আরী ইমাম তাদের কিতাবসমূহে স্পষ্টভাবে এ কথা বলেছে।

আক্বীদার ক্ষেত্রে তারা খবরে ওয়াহেদ হাদীস[১] গ্রহণ করে না। কারণ খবরে ওয়াহেদ হাদীসের মাধ্যমে নাকি ইলমুল ইয়াকীন বা সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যায় না। তবে মাসায়েলে সামইয়্যাহ বা গায়েবী ঘটনাবলী সংক্রান্ত বিষয়ে এবং যেসমস্ত ক্ষেত্রে যুক্তিশাস্ত্রের নিয়ম-কানুনের সঙ্গে কোন সাংঘর্ষিকতা পাওয়া যাবে না সেসব ক্ষেত্রে তারা খবরে ওয়াহেদ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে থাকে। তাদের মতে মুতাওয়াতির হাদীসের (যুক্তির সঙ্গে সাংঘর্ষিকতা হলে) তা'বীল করা ওয়াজিব। ওসমান ইবনে সাঈদ আদ দারেমী রহিমাহুল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি খবরে ওয়াহেদকে 'যন্নিইয়্যুছ ছুবুত' বা 'রাসুল থেকে প্রমাণিত কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে' বলেছে সে হলো বিশর আল মুরাইসী।

একজন মানুষ যখন বালেগ হয় তখন আশ'আরীদের মতে তার ওপর সর্ব প্রথম আবশ্যক হলো নযর[২] النظر চর্চা করা বা চর্চার ইচ্ছা করা। তারপর ঈমান আনা। আশ'আরীরা ঈমানের মাসআলার ব্যাপারে মুরজিয়া ও জাহমিয়্যাহদের মাঝামঝি অবস্থানে রয়েছে। যেই মুরজিয়ারা বলে থাকে, ঈমান শুদ্ধ হওয়ার জন্য আমল ছাড়া শুধু কালিমায় শাহাদাহ মুখে উচ্চারণ করাই যথেষ্ট এবং যেই জাহমিয়্যাহরা বলে থাকে, অন্তর থেকে শুধু বিশ্বাস করাই যথেষ্ট। পরবর্তী সময়ের জাহমিয়্যাহরা এই মতটাকে প্রাধান্য দিয়েছে যে, অন্তর থেকে বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তি আল্লাহর নিকট নাজাত লাভ করবে যদিও সে মুখে কালিমায় শাহাদাহ উচ্চারণ না করে। কোরআন তাদের মতে আল্লাহর হাকিকী কালাম নয়, বরং নফসী কালাম[৩]। এবং কোরআনসহ অন্য যে কিতাবগুলো আছে তা সবই সৃষ্ট বা মাখলুক।

---

[১] যে হাদীসটি মুতাওয়াতিরের মানে উত্তীর্ণ নয় তাকে খবরে ওয়াহেদ বলে। আর মুতাওয়াতির বলা হয় যে হাদীসটি এতো সংখ্যক মানুষ বর্ণনা করে যে, তাদের সকলে মিলে মিথ্যা বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করবে এটা ভাবা যায় না।

[২] তর্কশাস্ত্রে নযর বলা হয় এমন চিন্তা, যার ধারক এই চিন্তার মাধ্যমে কোন ইলম বা প্রবল ধারণা অন্বেষণ করে।

[৩] নফসী কালাম বলতে তারা বোঝাতে চায়, মূল কোরআন আল্লাহর নফসের মধ্যে নিহিত। আমরা যেটা দেখি এটা মূলত ঐ কোরআনের একটি প্রকাশভঙ্গি মাত্র।

তবে আশ'আরীদের কাছাকাছি অবস্থানে আছে মাতুরিদীরা। কারণ মাতুরিদীদের যে প্রতিষ্ঠাতা অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ আল মাতুরিদী তিনি আবুল হাসান আশ'আরীর সমসাময়িক ছিলেন। আহলুল হাদীস ও মু'তাযিলাসহ অন্য কালামীদের মধ্যকার চলমান 'যুদ্ধ' তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। মু'তাযেলা ও অন্যদের বিরুদ্ধে তারও সরব পদচারণা ছিলো। কিন্তু ইমাম আশ'আরীর পন্থায় নয়; ভিন্ন একটি পন্থায়। যদিও অনেক মাসআলার নতীজা বা ফলাফলে গিয়ে তারা দু'জন ফের এক হয়ে যান।

মাতুরিদী ফের্কা

এটি একটি বিদ'আতী কালামী[১] ফের্কা। আবু মানসুর মাতুরিদীর নেসবতের দিকে লক্ষ্য রেখে তার অনুসারীদেরকে মাতুরিদী বলা হয়। তাদের প্রতিপক্ষ মু'তাযেলা-জাহমিয়্যাহ ও অন্যদের সঙ্গে তর্ক করার ক্ষেত্রে তারা মস্তিষ্কপ্রসূত বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। উদ্দেশ্য, দ্বীন-ইসলামের হাকীকত ও ইসলামী আক্বীদা প্রমাণ করা। তারা আল্লাহর আসমাউল হুসনা বা সকল সুন্দর নাম মানে। তারা বলে আল্লাহকে ঐ নামগুলো দিয়েই ডাকা হবে যেই নামগুলো তিনি নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন এবং যে নামগুলো শরিয়াহয় উল্লেখ আছে। এ ব্যাপারে তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহর সঙ্গে একমত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে তারা শুধু কোরআন-সুন্নাহর দলীলের ওপর নির্ভর করে। তবে কয়েকটি নামের ব্যাপারে তারা আহলুস সুন্নাহর সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত, যে নামগুলো তারা আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়েছে। যেমন, صانع، قديم، ذات। তারা আল্লাহর জন্য মাত্র আটটি সিফত সাব্যস্ত করে। মাতুরিদীরা ঈমানের হাকীকতের প্রশ্নে বলে থাকে যে, তা কেবল অন্তরের সত্যায়ন। তবে তাদের কেউ কেউ মুখের স্বীকৃতিও যুক্ত করেছে এর সঙ্গে। ঈমান বাড়ে কমে এই বিষয়টি তারা মানে না।

---

[১] কালামী বলতে যারা তর্কশাস্ত্র বা মানতেক শাস্ত্র চর্চা করে।

খারেজী ফের্কা

তারা একটি বিদ'আতী ফের্কা। তাদের নাম খারেজী (বের হয়ে গেছে এমন) হওয়ার কারণ হলো, তারা দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে এবং মুসলিমদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোকদের বিরুদ্ধে তারা বের হয়েছে (বিদ্রোহ করেছে)। সাহাবায় কেরামের যুগ থেকেই তাদের উৎপত্তি। হারুরা নামক এক স্থানের দিকে খেয়াল রেখে তাদেরকে হারুরিয়্যাহও বলা হয়। এটি ইরাকের কুফা এলাকার নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম। এই হারুরায় তারা আলী রা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এরাই সালাফে সালেহীনের জামা'আহ থেকে বিচ্যুত সর্ব প্রথম ফের্কা। অর্থাৎ যখন তারা আলী রা.সহ মুসলিমদের অন্যান্য ইমাম ও খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। পরবর্তীতে তাদের থেকেও আরো কয়েকটি ফের্কা বের হয়। তবে তাদের সকলের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আক্বীদা হলো-

১- কবীরা গুনাহের কারণে তারা তাকফীর করে। যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ করবে সে তাদের মতে কাফের এবং মৃত্যুর পর সে জাহান্নামে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে।

২- বিবাহিত ব্যভিচারী ব্যক্তিকে পাথর মেরে হত্যা করার বিধান তারা মানে না। তাদের মতে চোরের হাত কাটতে হবে বোগল থেকে।

৩- হায়েজ অবস্থায়ও নারীদের ওপর তারা সালাত আদায় করা ফরজ মনে করে।

৪- মুসলিমদের হত্যা করা, মুসলিমদের মাল অন্যায়ভাবে ভোগ করা এবং তাদের নারীদেরকে বন্দী করা তারা বৈধ মনে করে। তাদের দাবি হলো, একমাত্র তারাই ঈমানের ওপর আছে। এসব আক্বীদার কারণ হলো, তারা কাফেরদের ব্যাপারে নাযিল হওয়া আয়াতগুলো মুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে।

৫- মুসলিমদের খলীফাগণ যদি ঈমানভঙ্গকারী কোন বিষয়ে লিপ্ত নাও হয়, বরং যদি কোন গুনাহে লিপ্ত হয় তাহলেই তারা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ মনে করে।

খারেজীদের কিছু বৈশিষ্ট্য- তাদের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো, নবী সা. তাদের সম্পর্কে সাহাবায় কেরামকে বলেছেন,

يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

"তোমাদের একেকজন তাদের সালাতের তুলনায় নিজের সালাত ও সিয়ামকে নগণ্য মনে করবে। এরা কোরআন পাঠ করবে, কিন্তু কোরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম হতে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক হতে বেরিয়ে যায়।" সহীহ মুসলিম- ১০৬৪। তাদের একটি চিহ্ন হলো, দ্বীনদারিতার উদ্দেশ্যে তাদের মাথা হলককৃত ও তাসবীতকৃত থাকবে। তাসবীদ (التسبيد) অর্থ, মাথার চুল উপড়ে ফেলা। এজন্যই আপনি দেখবেন হাদীসে এসেছে,

فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، ... مَحْلُوقُ الرَّأْسِ

"এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল, যার চোখ কোটরাগত ও মাথা মুণ্ডানো।" সহীহ বুখারী- ৪০৯৪। কোন কোন হাদীসে নবী সা. স্পষ্টভাবে বলেছেন,

سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ، أَوْ قَالَ: التَّسْبِيدُ.

"তাদের চিহ্ন হলো মাথা মুণ্ডানো।" সহীহ বুখারী- ৭১২৩। তাদের এই গোমরাহীর কারণ হলো, তাদের এমন একটি মূলনীতি আছে, যে ব্যাপারে তারা সকলেই একমত। আর তা হলো, যেকোন দলীল কোরআন থেকে গ্রহণ করা এবং কোরআনের অতিরিক্ত বক্তব্যসম্বলিত হাদীসগুলোকে নিঃশর্তভাবে (مطلقا) প্রত্যাখ্যান করা।

মাসআলা-

অধিকাংশ আহলে ইলম মারেকীন বা দ্বীন থেকে বহিষ্কৃত খারেজী আর জংগে জামাল ও সিফফিনের যুদ্ধে অংশ নেয়নি এমন খারেজীদের মধ্যে

পার্থক্য করে থাকেন। অর্থাৎ তা'বীলের আশ্রয় নিয়ে বিদ্রোহকারী খারেজীদের মধ্যে যারা গণ্য। সাহাবায় কেরামের পক্ষ থেকে এই মতটিই প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ আহলুল হাদীস ও ফকীহগণ এই মতের ওপরই আছেন।

খারেজীদের সকল ফের্কা এই ব্যাপারে একমত যে, গুনাহ করার দ্বারা একজন বান্দা কাফের হয়ে যায়। তারা ওসমান, আলী, তলহা, যুবায়ের, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুম এদের সকলকে তাকফীর করে। তাদের প্রায় ২০টির মতো শাখা রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি হলো-

১- আল আযারিকা। তারা আবু নাফে' রাশেদ ইবনে আযরাকের অনুসারী। তাদের একটি মতবাদ হলো, যে তাদের বিরোধিতা করবে তাকে হত্যা করা জায়েজ।

২- আন নাজাদাত। তারা নাজদাহ ইবনে আমের আন নাখয়ী এর অনুসারী। তারা মনে করে, যে তাদের বিরোধিতা করবে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।

মুরজিয়াহ

কথিত আছে যে, তাদেরকে মুরজিয়া (বিলম্বিতকারী) বলার কারণ হলো, তারা ঈমানের সংজ্ঞা থেকে আমলকে বিলম্বিত রেখেছে। অর্থাৎ আমলকে পিছিয়ে রেখেছে। তবে তাদের নামকরণের পেছনে ভিন্ন মতও পাওয়া যায়। তাদের মানহাজ হলো, ঈমানের সংজ্ঞা থেকে আমলকে পৃথক রাখা। এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, যে ব্যক্তি বলবে 'ঈমান বাড়ে-কমে না' এবং 'ঈমানের ক্ষেত্রে ভাগ করা (الاستثناء) জায়েজ নেই' সেই ব্যক্তিই মুরজিয়া। তবে পরবর্তীতে আরো কিছু শ্রেণীর ব্যাপারেও ইরজা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ঐ সমস্ত জাহমিয়্যাহর ব্যাপারে, যারা বলে ঈমান কেবল জানার নাম এবং ঐ সমস্ত কাররামিয়াহর ব্যাপারে, যারা বলে ঈমান কেবল মৌখিক স্বীকৃতির নাম। মুরজিয়ারাই এই কথা বলে থাকে যে, কবিরা গুনাহকারী ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী। তাদের মতে ঈমান থাকলে গুনাহ ঈমানের জন্য কোন সমস্যা নয় না। সুতরাং কবীরা

গুনাহকারী ব্যক্তি ক্রুটিযুক্ত ঈমানের অধিকারী হবে না বরং সে পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারীই থাকবে।

মুরজিয়াদের মধ্যে একটি গ্রুপ আছে যারা হলো مرجئة الفقهاء বা মুরজিয়া ফকীহ। তাদের মতবাদ হলো, ঈমান কেবল মৌখিক স্বীকৃতি ও অন্তরের বিশ্বাসের নাম। ঈমানের হাকীকতের মধ্যে আমল অন্তর্ভূক্ত হবে না। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন মূর্তিকে সেজদা করল সে কাফের হবে ঠিকই, কিন্তু এই কর্মের কারণে নয়। বরং এমন কিছুর কারণে, যা তার অন্তরে উদয় হয়েছে এবং তাকে কর্মটি করতে প্ররোচিত করেছে।

বর্তমান সময়ের মুরজিয়া যারা-

১- আল জামিয়্যাহ (الجاميّة) (মুরজিয়া)

তারা হলো, মুহাম্মাদ আমান আল জামী'র অনুসারী। এই লোকটি আফ্রিকান; ইথিওপিয়ার অধিবাসী। সে মদীনা মুনাওয়ারায় আসে এবং মসজিদে নববীতে ও জামিয়া ইসলামিয়্যায় দারস (ক্লাস) প্রদান করে। যেসকল শায়খ ও তালিবুল ইলম তাগুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের ব্যাপারে তাগুতের পক্ষাবলম্বন করে দেয়া প্রসিদ্ধ বক্তৃতাগুলোর 'মালিক' হলো এই মুহাম্মাদ ইবনে আমান আল জামী। কয়েক বছর হলো সে মারা গিয়েছে। ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত এই ফের্কাটির কিছু বৈশিষ্ট্য হলো, তাগুতের সঙ্গে দহরম মহরম করা। তাগুতদেরকে শরয়ী উলুল আমর[১] বানাতে তাদের রয়েছে প্রবল প্রচেষ্টা। তারা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং তাদেরকে খারেজী বলে আখ্যায়িত করে। তবে জামিয়্যাহদের তাগুতের পদলেহনকারী একজন শায়খ, যার নাম রবী' আল মাদখালী তার নামের নেসবতের দিকে লক্ষ্য রেখে এই দলের অনুসারীদেরকে মাদখালীও বলা হয়।

[১] উলুল আমর বলা হয় মুসলিমদের শাসক বা শাসকের প্রতিনিধি।

২- আস সুরুরিয়্যাহ (السرورية) (মুরজিয়া)

তারা হলো মুহাম্মাদ ইবনে সুরুর ইবনে যাইনুল আবেদীন। এই লোকটি শামের অধিবাসী। ইখওয়ানের সদস্য ছিলো। সে জাযীরাতুল আরবের বিভিন্ন ইন্সটিটিউটে দারস প্রদানের জন্য সেখানে গমন করে। সুরুরিয়্যাহদের মানহাজ হলো, বর্তমান যামানা হলো মক্কী যামানা। তারা এখন শুধু দাওয়াহর কাজ করবে। এই যামানায় জিহাদ করা উপযুক্ত কাজ হবে না। তো যখনই কোন ভূখণ্ডে জিহাদ কায়েম হয় তখনই তারা সেখানে গিয়ে একটা ইখওয়ানী চিন্তাধারার সশস্ত্র দল তৈরি করে, যারা গণতন্ত্র নিয়ে পড়ে থাকে আবার এই দাবিও করে যে, তারা শরীয়াহ কায়েম করতে চায়। সুরুরিয়্যাহদের বন্ধুত্ব মূলতঃ ইখওয়ানের সঙ্গে। সুরুরিয়্যাহরা ইসলামের স্বার্থের দোহাই দিয়ে পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করা ও গণতন্ত্রে শরীক হওয়ার মাধ্যমে শিরক করার বৈধতা দেয়। সত্যপন্থী মুজাহিদদের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের সঙ্গে আঁতাতকারী সাহাওয়াতদেরকে[১] সমর্থন করার ক্ষেত্রে তারা সব সময়ে আগে আগে থাকে।

তাবলীগ জামাত

এটি এমন একটি দল, যারা দ্বীনের ঐ অংশটুকু গ্রহণ করে, যা ওয়াজ-নসীহত ও বিভিন্ন আমলের ফজীলতের সাথে সম্পর্কিত। পক্ষান্তরে তারা আসলুদ দ্বীন (দ্বীনের মৌলিক বিষয়) এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও দ্বীনের সর্বোচ্চ চূড়া (জিহাদ) পরিত্যাগ করে। এই দলটি দাওয়াহ প্রদানের ক্ষেত্রে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর আয়াতসমূহকে তাদের তরীকার মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। অথচ এটি সুস্পষ্ট গোমরাহী। তাদের আরেকটি গোমরাহী হলো, আমরা যে যুগে বসবাস করছি এই যুগটি এখনো মক্কী যুগে আছে। সুতরাং এখন জিহাদ ফরজ নয়।

এই দলের প্রতিষ্ঠাতা হলো মুহাম্মাদ ইলিয়াস কান্ধলবী। মৃত্যু- ১৩৬৪ হি.। তার জন্ম ভারতের কান্ধালা গ্রামে। তাবলীগ জামাতের অধিকাংশ লোক

[১] সাহওয়াত অর্থ হলো জাগরণ। সাহাওয়াত শব্দটি বহুবচন। মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মুরতাদ-কাফেররা যেসমস্ত আঞ্চলিক সশস্ত্র মিলিশিয়া তৈরি করে, মুজাহিদগণ তাদেরকে নাম দিয়েছেন সাহাওয়াত।

বিদ'আতী, সুফী ও চাল-চলনে নবী সা. এর আদর্শের মুখালেফ। তবে তাদের সবচেয়ে বড় গোমরাহী হলো, মানুষের সামনে তাগুতকে অস্বীকার করার বিষয়টি তুলে না ধরা, শিরক-কুফরের বিরোধিতা না করা এবং এ ব্যাপারে সতর্ক না করা। বরং তাদের অনেকে তো কবরসংক্রান্ত শিরকেও পতিত হয়েছে নাউযুবিল্লাহ।

আলমানিয়্যাহ (العلمانية) (ধর্মনিরপেক্ষতা)

আলমানিয়্যাহ শব্দের সঠিক অনুবাদ হচ্ছে ধর্মহীনতা। এটি একটি সামাজিক সংগঠন। তাদের উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে পরকাল বিষয়ে ব্যস্ত হওয়া থেকে ফিরিয়ে এনে একমাত্র দুনিয়ার ব্যস্ততায় নিমজ্জিত করা। এ কারণেই আলমানিয়্যাহ শব্দের সঠিক অর্থ হলো, রাষ্ট্র থেকে দ্বীনকে আলাদা করা অথবা ধর্মহীনতার ওপর জীবনকে গড়ে তোলা। তাদের এই কার্যক্রম ব্যক্তিবিশেষের জন্যও হতে পারে আবার একটি সমগ্র জাতির জন্যও হতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেক্যুলারিজমের শাসনাধীনে শরয়ী বিধি-বিধান পরিপূর্ণরূপে অকার্যকর থাকে। কেউ শরয়ী বিধান অনুযায়ী বিচার করলে তা একটি অপরাধ হওয়ার ভিত্তিতে বাতিল বলে গণ্য হয় এবং তাকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَفَحُكۡمَ الۡجَاهِلِيَّةِ يَبۡغُوۡنَ ؕ وَ مَنۡ اَحۡسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكۡمًا لِّقَوۡمٍ يُّوۡقِنُوۡنَ.

{তবে কি তারা জাহেলিয়াতের বিধি-বিধান কামনা করে? আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে আর কে শ্রেষ্ঠতর?} আল মায়িদা- ৫০। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন,

وَ مَنۡ لَّمۡ يَحۡكُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡكٰفِرُوۡنَ.

{আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করবে না তারাই কাফের।} আল মায়িদা- ৪৪

ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্র

ডেমোক্রেসি মূলত একটি গ্রিক শব্দ। মূল শব্দ হলো, Demos ও Kratia। এই দুইটি শব্দ যোগ হয়ে সংক্ষেপে হয়েছে Democracy বা ডেমোক্রেসি। এর অর্থ হলো, জনগণের শাসন বা জনগণের ক্ষমতা। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে জনগণই নিজেদেরকে শাসন করে। এভাবে যে, তারা নিজেরাই বিভিন্ন রাজনীতিক দল নির্বাচিত করে, যারা সংসদে গিয়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব করে। এই নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করে। যে সংবিধান জনগণকে শাসন করে থাকে। সকল নির্বাচিত সদস্য এই সংবিধানকে সম্মান করা এবং সংবিধান অনুযায়ী কাজ করার শপথ গ্রহণ করে। এভাবেই তারা আল্লাহর কিতাবকে তাদের পেছনে রেখে দেয় এবং তাদের শয়তানরা এবং তাদের মনের মানশা ও আকল তাদেরকে যা বলে দেয় সেই অনুযায়ীই তারা মানুষকে শাসন করতে থাকে। তারা ধর্মীয় স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বাকস্বাধীনতায় বিশ্বাস করে, যদিও তা আল্লাহর দ্বীনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়। এছাড়াও আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বারোপ করা হয় এমন বেশ কিছু কুফরী আইনে তারা বিশ্বাস করে।

বর্তমান যুগে যারা এই গণতন্ত্রের ঝাণ্ডা বহন করছে, এটাকে প্রচার-প্রসার করছে এবং এই গণতন্ত্রের জন্য আইন প্রণয়ন করছে তাদের মধ্যে একটি দল হলো তথাকথিত ‘ইখওয়ানুল মুসলিমীন’। এছাড়াও যারা নিজেদেরকে সালাফী দাবি করে; অথচ তাদের সঙ্গে সালাফদের কোন সম্পর্কই নেই। সুতরাং একজন মুসলিমের জন্য আবশ্যক হলো, এই পার্লামেন্টগুলোর হাকীকত সম্পর্কে জানা। এগুলোতে যে শিরকী কর্মকাণ্ড চলছে এবং তাওহীদ বর্জন করা হচ্ছে সে সম্পর্কে অবগতি লাভ করা। এতে করে একজন মুসলিমের দ্বীন ও ঈমান নিরাপদ থাকবে। এই শিরকের মধ্যে তথাকথিত মিলিটারি কোর্ট বা সামরিক আদালতও অন্তর্ভূক্ত হবে, যেখানে সেনাবাহিনীর মতো তাগুতের সৈনিকেরা বিচারের জন্য দ্বারস্থ হয়। আরো অন্তর্ভূক্ত হবে মিডিয়া কোর্ট ও কর্মাশিয়াল বা বাণিজ্যিক কোর্ট। কারণ

এগুলোর সব ক'টিই আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান বাদ দিয়ে বিচার করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ.

{আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করবে না তারাই কাফের।} আল মায়িদা- ৪৪

আমরা ইসলামের প্রথম রোকন ও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন মাসআলার আলোচনা শেষ করলাম।

ইসলামের দ্বিতীয় রোকন হলো,

সালাত কায়েম করা

আল্লাহ সালাতকে বানিয়েছেন দ্বীনের খুঁটি এবং ইসলামের দ্বিতীয় রোকন, যা আদায় ব্যতীত একজন ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ করাই শুদ্ধ হবে না। সালাত আদায় করার ক্ষেত্রে গড়িমসি ও অলসতা করা মুনাফেকদের লক্ষণ। সালাত পরিত্যাগ করার অর্থ কুফর, গোমরাহী ও ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়া। কারণ সহীহ হাদীসে আছে যে, নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

"একজন ব্যক্তি ও শিরকের মাঝে পার্থক্য হলো সালাত ত্যাগ করা।" সহীহ মুসলিম- ৮২। তিনি আরো বলেন,

العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"যে চুক্তি আমাদের মাঝে ও তাদের মাঝে বিদ্যমান তা হলো সালাত। অতএব যে ব্যক্তি সালাত ত্যাগ করবে সে অবশ্যই কাফের হয়ে যাবে।" সুনানে তিরমিযী[১]- ২৮০৯। সালাত হলো মূল ইসলাম ও দ্বীনের খুঁটি। এটি বান্দা ও তাঁর রবের মাঝে সম্পর্কের একটি সেতুবন্ধন। যেমন সহীহ হাদীসে আছে, নবী সা. বলেছেন,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ.

"তোমাদের কেউ যখন সালাতে থাকে তখন তো সে তার রবের সঙ্গে একান্তে কথা বলে।" সহীহ মুসলিম- ৫৫১। সালাত হলো বান্দার রবের প্রতি তার ভালোবাসা এবং তাঁর নেয়ামতের কদর করার বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহর নিকট সালাতের যে কত বড় শান এর একটি প্রমাণ হলো, সালাতই একমাত্র বিধান যা নবী সা. এর ওপর সর্বপ্রথম ফরজ করা হয়েছে এবং এই উম্মাহর ওপর মে'রাজের রাতে আসমানে তা ফরজ করা হয়েছে। যখন রসুলুল্লাহ সা.কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন আমল সর্বশ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন,

[১] মুহাক্কিক বলেন, এটি একটি শক্তিশালী হাদীস।

الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا.

"সময়মতো সালাত আদায় করা।" সহীহ বুখারী- ৫০৪। আল্লাহ সালাতকে বানিয়েছেন গুনাহ হতে পবিত্র হওয়ার একটি মাধ্যম। নবী সা. বলেন,

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.

"তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, তোমাদের কারো বাড়ির দরজার সামনেই যদি একটি নদী থাকে আর সে ঐ নদীতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে? সবাই বলল, না, তার শরীরে কোন প্রকার ময়লা থাকবে না। তখন রসুলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটিই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর দ্বারা আল্লাহ গুনাহসমূহ মুছে দেন।" সহীহ মুসলিম- ৬৬৭। নবী সা. এর আরেকটি হাদীসে এসেছে যে, তিনি দুনিয়া ছেড়ে বিদায় নেওয়ার সময়ে উম্মাহর প্রতি তাঁর সর্বশেষ ওসিয়ত ও নির্দেশনা ছিলো-

الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، اتَّقُوا اللهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

"তোমরা সালাতের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারেও।" মুসনাদে আহমাদ[১]- ৫৮৫

আল্লাহ তা'আলা কোরআন কারীমে সালাতকে মহান হিসেবে তুলে ধরেছেন। সালাত ও সালাত আদায়কারীকে সম্মানিত ঘোষণা করেছেন। কোরআনের অনেক স্থানে আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য ইবাদাত থেকে আলাদা করে সালাতকে খাসভাবে উল্লেখ করেছেন এবং সালাত আদায়ের প্রতি বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

حٰفِظُوۡا عَلَی الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوۃِ الۡوُسۡطٰی وَ قُوۡمُوۡا لِلّٰہِ قٰنِتِیۡنَ.

{তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের প্রতি এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা দাঁড়াবে বিনীতভাবে।} আল বাকারা- ২৩৮। তিনি আরো বলেন,

وَ اَقِمِ الصَّلٰوۃَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوۃَ تَنۡہٰی عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَ الۡمُنۡکَرِ.

---

[১] মুহাক্কিক বলেন, এটি একটি সহীহ হাদীস, তবে এই সনদটি হাসান। প্রকা. মু'আসসাতুর রিসালাহ।

{আর আপনি সালাত কায়েম করুন। নিশ্চই সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে।} আল আনকাবুত- ৪৫। তিনি অন্যত্র বলেন,

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

{হে ঐ সকল লোক, যারা ঈমান এনেছো। তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে রয়েছেন।} আল বাকারা- ১৫৩। তিনি আরো বলেন,

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا.

{নিশ্চই সালাত মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ।} আন নিসা- ১০৩ যে ব্যক্তি সালাতকে বিনষ্ট করেছে আল্লাহ তার ওপর শাস্তি অবধারিত করে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.

{তাদের পরে এলো অযোগ্য উত্তরসূরীরা, যারা সালাতকে বিনষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই শাস্তির সম্মুখীন হবে।} মারইয়াম- ৫৯। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা তাঁর সম্মানিত কিতাবে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, জাহান্নামে অপরাধীরা প্রবেশ করার সর্ব প্রথম কারণ হলো, সালাত পরিত্যাগ করা। তিনি বলেন,

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ. قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ.

{‘সাক্বারে’[১] কোন জিনিস তোমাদেরকে প্রবেশ করিয়েছে? তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম না।} আল মুদ্দাছছির- ৪২, ৪৩। রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন,

مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

“যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডা সময়ের সালাত আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” সহীহ বুখারী- ৫৪৮। অর্থাৎ ফজর ও আসরের সালাত। প্রত্যেক রাসুলের শরীয়াহতেই সালাত দ্বীনের একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে সাব্যস্ত। সালাত একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য ও একমাত্র তাঁর প্রতিই আত্মসমর্পণের একটি চিহ্ন বহন করে। বান্দার অন্তরে তাকওয়া, আল্লাহমুখিতা, সবর, জিহাদ ও তাওয়াক্কুল গড়ে তোলে। সালাত দ্বীন-

[১] সাক্বার একটি জাহান্নামের নাম।

ইসলামের এমন একটি বাহ্যিক নিদর্শন, যা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান ও ইখলাসের প্রমাণ বহন করে। সুতরাং প্রতিটি মুসলিমের ওপর আবশ্যক হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর গজব ও তাঁর কঠিন শাস্তির ভয়ে সময়মতো সালাত পড়ার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া এবং আল্লাহ যেভাবে নির্ধারণ করেছেন সেভাবেই সালাত কায়েম করা। তবে সালাত আদায় করা ও সালাত শিক্ষা করার পূর্বে আমাদেরকে প্রথমে অবশ্যই ঐ শর্তগুলো জেনে নিতে হবে যেগুলো সালাতের পূর্বেই বিদ্যমান থাকা শর্ত। এই শর্তগুলোকে শুরুতুস সালাহ বা সালাতের শর্ত বলে।

শুরুতুস সালাহ বা সালাতের শর্তসমূহ-

সালাতের শর্ত নয়টি- ১- মুসলিম হওয়া। ২- বোধসম্পন্ন হওয়া। ৩- বড় হওয়া। ৪- নাপাকি দূর করা। ৫- সতর ঢাকা। ৬- সালাতের সময় হওয়া। ৭- কিবলামুখী হওয়া। ৮- নিয়ত করা। ৯- হাদাছ দূর করা।

১ নং শর্ত- মুসলিম হওয়া। এর বিপরীত হলো কাফের। কাফের ব্যক্তির আমল প্রত্যাখ্যাত। সে যেই আমলই করুক না কেন। দলীল হলো, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ط اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚ وَ فِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ.

{মুশরিকদের অধিকার নেই যে, তারা আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে, নিজেদের ওপর কুফরীর সাক্ষ্য দেয়া অবস্থায়। এদেরই আমলসমূহ বরবাদ হয়েছে এবং জাহান্নামেই তারা স্থায়ী হবে।} আত তাওবাহ- ১৭। তিনি আরো বলেন,

وَ قَدِمْنَاۤ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا.

{আর আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি অগ্রসর হয়ে সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।} আল ফুরক্বান- ২৩

২ নং শর্ত- বোধসম্পন্ন হওয়া। এর বিপরীত হলো পাগল হওয়া। পাগল ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত তার আমলনামা লিখা হয় না। দলীল হলো হাদীসে আছে,

رُفِعَ القلم عن ثلاثةٍ: عن النَّائم حتى يستيقظَ، وعن الصَّبِيِّ حتى يَحْتَلِمَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ.

"তিন ধরণের লোকের ওপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে- ১. ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয়। ২. নাবালেগ, যতক্ষণ না সে বালেগ হয় এবং ৩. পাগল, যতক্ষণ না জ্ঞানসম্পন্ন হয়।" সুনানে আবু দাউদ[১]- ৪৪০৩

৩ নং শর্ত- বড় হওয়া। এর বিপরীত হলো ছোট হওয়া। বড় হওয়ার বয়সসীমা হলো ৭ বছর। এরপর থেকে তাকে সালাত আদায় করতে বলা হবে। কারণ নবী সা. বলেছেন,

مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

"তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে ৭ বছর বয়সে সালাত আদায় করতে আদেশ করো আর ১০ বছর হলে সালাতের জন্য প্রহার করো। এবং তোমরা তাদের শোয়ার স্থান পৃথক করে দাও।" মুসনাদে আহমাদ[২]- ৬৭৫৬

৪ নং শর্ত- তিন জায়গা থেকে নাপাকি দূর করা- ১. শরীর। ২. কাপড়। ৩. সালাত আদায়ের স্থান। দলীল হলো আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ.

{আর আপনি আপনার কাপড়সমূহ পবিত্র করুন।} আল মুদ্দাছছির- ০৪

৫ নং শর্ত- সতর ঢাকা। আহলুল ইলম এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্বেও উলঙ্গ হয়ে সালাত আদায় করবে তার সালাত নষ্ট। পুরুষের সতর হলো, নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত। দাসীর সতরও অনুরূপ। আর স্বাধীন নারীর পুরো শরীরই সতর, শুধু মুখ ও দুই হাত ব্যতীত

---

[১] মুহাক্কিক বলেন, এটি একটি সহীহ হাদীস। প্রকা. দারুর রিসালাহ।

[২] মুহাক্কিক বলেন, এর সনদটি হাসান। প্রকা. মু'আসসাতুর রিসালাহ।

২-

(কব্জি পর্যন্ত)[1]। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰبَنِيۡۤ اٰدَمَ خُذُوۡا زِيۡنَتَكُمۡ عِنۡدَ كُلِّ مَسۡجِدٍ.

{হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময়ে তোমরা সুন্দর পোশাক গ্রহণ করো।} আল আ'রাফ- **৩১**

৬ নং শর্ত- সালাতের সময় হওয়া। সুন্নাহ থেকে এ ব্যাপারে দলীল হলো জিবরীল আ. এর হাদীস। জিবরীল আ. নবী সা.কে সালাতের শুরু ও শেষ ওয়াক্তে সালাত পড়িয়েছেন। এরপর তিনি বলেছেন,

يا محمَّد، هذا وقتُ الأنبياء مِن قَبلِكَ، والوقتُ ما بينَ هذَينِ الوقتَينِ.

"হে মুহাম্মাদ! ... সালাত হলো এই দুই সময়ের মধ্যবর্তী সময়ে।" আবু দাউদ[2]- ৩৯৩। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتۡ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ كِتٰبًا مَّوۡقُوۡتًا.

{নিশ্চই সালাত মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ।} আন নিসা- **১০৩**

৭ নং শর্ত- কেবলামুখী হওয়া। দলীল হলো আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَدۡ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجۡهِكَ فِى السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبۡلَةً تَرۡضٰهَا ۖ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ ط وَ حَيۡثُ مَا كُنۡتُمۡ فَوَلُّوۡا وُجُوۡهَكُمۡ شَطۡرَه ط وَ اِنَّ الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ لَيَعۡلَمُوۡنَ اَنَّهُ الۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّهِمۡ ط وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعۡمَلُوۡنَ.

{অবশ্যই আমি আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানো লক্ষ্য করি। সুতরাং অবশ্যই আমি আপনাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেবো যা আপনি পছন্দ করেন। অতএব আপনি মসজিদুল হারামের দিকে চেহারা ফিরান। আর তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের চেহারাসমূহকে এর দিকে ফিরাও} আল বাকারা- ১৪৪

৮ নং শর্ত- নিয়ত করা। নিয়তের স্থান হলো অন্তর। দলীল হলো হাদীসে আছে,

---

[1] যতক্ষণ না আশেপাশে কোন গায়রে মাহরাম পুরুষ থাকে। গায়রে মাহরাম থাকলে হাত-মুখও ঢাকতে হবে। আল্লাহ ভালো জানেন।

[2] মুহাক্কিক বলেন, এর সনদ হাসান। প্রকা. দারুর রিসালাহ।

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

{প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে।} সহীহ বুখারী- ০১। মুখে নিয়ত করা বিদ'আত।

৯ নং শর্ত- হাদাছ (অপবিত্রতা) দূর করা। হাদাছ দূর করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হাদাছ বা অপবিত্রতা হতে পবিত্রতা অর্জন করা। এটি দুইভাবে হয়ে থাকে। ১- গোসল করার মাধ্যমে। ২- ওজু করার মাধ্যমে।

প্রথমতঃ গোসল করা। বড় হাদাছ হতে পবিত্র হতে হলে গোসল করতে হবে। বড় হাদাছ বলতে যে হাদাছ জানাবাতের[১] কারণে কিংবা হায়জ-নেফাসের কারণে হয়ে থাকে। এই গোসল নিম্নোক্ত দুই পদ্ধতির যেকোন এক পদ্ধতিতে হতে পারে-

১- ন্যূনতম গোসল। অর্থাৎ পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে চুল-পশমের স্থানসহ পুরো শরীরে পানি ঢালা এবং কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া।

২- সুন্নাহ অনুযায়ী গোসল। এই গোসলের পদ্ধতি-

- উচ্চারণ না করে অন্তর থেকে গোসলের নিয়ত করবে।
- তারপর আল্লাহর নাম নিবে অর্থাৎ 'বিসমিল্লাহ' বলবে।
- লজ্জাস্থান ও নাপাকী লেগে আছে এমন স্থানগুলো ধৌত করবে।
- এরপর পরিপূর্ণ ওজু করবে।
- এরপর দুই হাতভরে মাথায় পানি ঢালবে। পুরো মাথায় পানি পৌঁছলে মাথায় তিনবার পানি ঢেলে দিবে।
- এরপর পুরো শরীর ধৌত করবে।

আয়েশা রা. হতে বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. وَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا.

[১] বীর্যস্খলন বা সহবাসের মাধ্যমে অপবিত্র অবস্থাকে জানাবাত বলে।

"আল্লাহর রাসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাবাতের গোসল[১] করতেন, তখন তিনি দু'হাত ধৌত করতেন এবং সালাতের ওজুর মত ওজু করতেন। তারপর গোসল করতেন। পরে তাঁর হাত দিয়ে চুল খিলাল করতেন। চামড়া ভিজেছে বলে যখন তিনি নিশ্চিত হতেন, তখন তাতে তিনবার পানি ঢালতেন। তারপর সমস্ত শরীর ধুয়ে ফেলতেন। তিনি (আয়েশা রা.) বলতেন, আমি ও আল্লাহর রাসুল সা. এক গামলা থেকে গোসল করতাম আমরা উভয়েই একসঙ্গে তা থেকে পানি উঠাতাম।" সহীহ বুখারী- ২৬৯

দ্বিতীয়তঃ[২] ওজু করা। এটি হলো ছোট হাদাছের কারণে পবিত্রতা অর্জন করার মাধ্যম। ছোট হাদাছ বলতে যেমন, মল-মূত্র, বায়ূ নিঃসরণ, গভীর ঘুম এবং উটের গোশত খাওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا قُمۡتُمۡ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغۡسِلُوۡا وُجُوۡهَكُمۡ وَ اَيۡدِيَكُمۡ اِلَى الۡمَرَافِقِ وَ امۡسَحُوۡا بِرُءُوۡسِكُمۡ وَ اَرۡجُلَكُمۡ اِلَى الۡكَعۡبَيۡنِ.

{হে ঐ সকল লোক যারা ঈমান এনেছো, যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াতে চাও তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও এবং তোমাদের মাথা মাসাহ করো এবং পায়ের টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে নাও।} আল মায়িদা- ০৬। এই আয়াতটিতে ঐ কাজগুলোই করতে বলা হয়েছে যেগুলো ওজুর সময়ে করতে হয়। এগুলোকে ওজুর ফরজ বলে। অর্থাৎ-

১- মুখ ধৌত করা। কুলি ও নাকে পানি দেওয়াও এর অন্তর্ভূক্ত।

২- উভয় হাত কনুইসহ ধৌত করা।

৩- সমস্ত মাথা মাসাহ করা। দুই কানও এর অন্তর্ভূক্ত।

৪- উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা।

---

[১] বড় হাদাছ হতে পবিত্রতা অর্জনের গোসলকে জানাবাতের গোসল বলা হয়।

[২] অর্থাৎ হাদাস হতে পবিত্রতা অর্জনের দ্বিতীয় মাধ্যম।

ওজু করার তরীকা-

১- মুখে নিয়ত না করে অন্তর থেকে ওজুর নিয়ত করবে। কেননা নবী সা. ওজু বা সালাতে এমনকি তাঁর কোন ইবাদাতেই মুখে নিয়ত করেননি। আরো কারণ হলো, অন্তরে কী আছে তা তো আল্লাহ অবশ্যই জানেন। সুতরাং অন্তরের বিষয়টি নতুন করে মুখে বলার কোন প্রয়োজন নেই।

২- তারপর 'বিসমিল্লাহ' বলে আল্লাহর নাম নিবে।

৩- দুই হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে।

৪- তিনবার কুলি করবে ও নাকে পানি দিবে।

৫- তিনবার মুখ ধৌত করবে। প্রস্থের হিসাবে এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত এবং দৈর্ঘ্যের হিসেবে মাথার চুল যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখান থেকে নিয়ে দাঁড়ির নিচ পর্যন্ত।

৬- উভয় হাত তিনবার ধৌত করবে। আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে নিয়ে কনুই পর্যন্ত। প্রথমে ডানহাত পরে বামহাত।

৭- মাথা একবার মাসাহ করবে। উভয় হাত ভিজিয়ে মাথার অগ্রভাগ থেকে নিয়ে মাথার পেছন পর্যন্ত এবং পেছন থেকে নিয়ে আবার মাথার অগ্রভাগ পর্যন্ত একবার টেনে দিবে।

৮- উভয় কান একবার মাসাহ করবে। কানের ছিদ্রে শাহাদাত আঙ্গুল প্রবেশ করাবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে কানের বহিরাংশ মাসাহ করবে।

৯- সবশেষে উভয় পা তিনবার ধৌত করবে। পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে নিয়ে টাখনু পর্যন্ত। প্রথমে ডান পা পরে বাম পা।

এ ব্যাপারে দলীল হলো,

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ: دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

ওসমান রা. এর আযাদকৃত গোলাম হুমরান রহ. হতে বর্ণিত যে, তিনি ওসমান রা.কে ওজুর পানি আনাতে দেখলেন। তারপর তিনি সে পাত্র

থেকে উভয় হাতের ওপর পানি ঢেলে তা তিনবার ধুয়ে ফেললেন। এরপর তাঁর ডান হাত পানিতে ঢুকালেন। এরপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝেড়ে ফেললেন। এরপর তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন, এরপর মাথা মাসাহ করলেন। এরপর প্রত্যেক পা তিনবার ধোয়ার পর বললেন, আমি রাসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার এ ওজুর মতো ওজু করতে দেখেছি এবং রাসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার এ ওজুর মতো ওজু করে দুই রাকাত সালাত আদায় করবে এবং তার মধ্য কোন বাজে খেয়াল মনে আনবে না, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দিবেন।" সহীহ বুখারী- **১৫৮**

যদি পানি না থাকার কারণে কিংবা পানি ব্যবহার করলে ক্ষতি হবে এমন আশংকার কারণে পানি ব্যবহার করতে না পারে তাহলে তায়াম্মুম করবে।

তায়াম্মুম

তায়াম্মুমের বিধানটি আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলিমদের জন্য পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি সাহায্য। যে ব্যক্তি পানি পাবে না বা পানি ব্যবহার করলে ক্ষতির সম্মুখীন হবে তার জন্য আল্লাহ তায়াম্মুম করার অনুমতি দিয়েছেন। তায়াম্মুম করতে হয় পবিত্র মাটি দ্বারা। তায়াম্মুমের পদ্ধতি হলো, মাটিতে দুই হাত মেরে মুখ ও দুই হাত মাসাহ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

...فَلَمۡ تَجِدُوۡا مَآءً فَتَيَمَّمُوۡا صَعِيۡدًا طَيِّبًا فَامۡسَحُوۡا بِوُجُوۡهِكُمۡ وَ اَيۡدِيۡكُمۡ مِّنۡهُ.

{...ফলে যদি তোমরা পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে। সুতরাং তা দ্বারা মুখমণ্ডলে ও হাতে মাসাহ করবে।} আল মায়িদা- ০৬। আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. বলেন,

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِد الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا). فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بها وَجْهَهُ.

“নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোন প্রয়োজনে (কোন এক স্থানে) পাঠালেন। কিন্তু সেখানে আমি জুনুবী (অপবিত্র) হয়ে পড়ি এবং পানি না পাওয়ায় ধূলার ওপর (শুয়ে) গড়াগড়ি দেই যেভাবে চতুষ্পদ জন্তু গড়াগড়ি দিয়ে থাকে। তারপর নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফিরে এসে আমি ঘটনাটি বর্ণনা করি। তখন তিনি আমাকে বললেন, ঐ অবস্থায় তোমার পক্ষে এতটুকুই যথেষ্ট ছিলো যে, তুমি তোমার হাত দু’টিকে এভাবে করতে (তিনি তা দেখাতে গিয়ে) তাঁর দু’হাতের তালুকে একবার মাটির ওপরে মারলেন, তারপর বাম হাত দিয়ে ডান হাতের তালুর পিঠের ওপর মাসাহ করলেন অথবা তাঁর বাম হাতের তালুর পিঠ ডান হাত দ্বারা মাসাহ করলেন। তারপর দুই হাত দিয়ে মুখমণ্ডলও মাসাহ করলেন।” সহীহ বুখারী- ৩৪০

ফরজ সালাত

আল্লাহ তা’আলা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর দিন-রাত মিলিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। সালাতগুলো হলো- ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা।

১- ফজরের সালাত। রাকাতসংখ্যা- ২। ওয়াক্ত- ফজরে ছানী উদিত হওয়া থেকে সূর্য উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত। ফজরে ছানী হলো, শেষ রাতে পূর্ব দিক হতে একটি প্রশস্ত আলোকরেখা।

২- যোহরের সালাত। রাকাতসংখ্যা- ৪। ওয়াক্ত- সূর্য মাঝ আকাশ থেকে হেলে যাওয়ার পর থেকে নিয়ে প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার অনুরূপ হওয়ার আগ পর্যন্ত ‘ফাই’উয যাওয়াল’[১] বাদে।

৩- আসরের সালাত। রাকাতসংখ্যা- ৪। ওয়াক্ত- আসরের ওয়াক্ত যোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর থেকে শুরু হয় এবং প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার দিগুণ হওয়া পর্যন্ত আসরের ওয়াক্ত থাকে। তবে প্রয়োজনে সূর্য ডোবার আগ পর্যন্ত আসরের সালাত পড়া যায়।

---

[১] ফাই’উয যাওয়াল মানে হলো, সূর্য যখন বরাবর মাঝ আকাশে থাকে তখন প্রতিটি বস্তুর একটি নিজস্ব ছায়া থাকে। উক্ত ছায়াকে ফাই’উয যাওয়াল বলে।

৪- মাগরিবের সালাত। রাকাতসংখ্যা- ৪। ওয়াক্ত- সূর্যাস্তের পর থেকে নিয়ে দিগন্তের লাল রেখা বা দিগন্তলালিমা অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।

৫- এশার সালাত। রাকাতসংখ্যা- ৪। ওয়াক্ত- মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর থেকে নিয়ে রাতের প্রথম এক তৃতীয়াংশ বা অর্ধরাত্রি পর্যন্ত।

সালাত আদায়ের পদ্ধতি

প্রথমে আমাদের উল্লিখিত পদ্ধতিতে শরীর ও স্থান পবিত্র হতে হবে। সালাতের সময় হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবে। কিবলামুখী হতে হবে। কিবলা মানে হলো, মক্কা মুকাররমায় অবস্থিত আল্লাহর সম্মানিত ঘর। অন্তর থেকে সালাতের নিয়ত করবে। ফরজ বা নফল যে সালাতই হোক। তারপর নিম্নোক্ত কাজগুলো করবে-

১- 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীরে তাহরীমা দিবে।

২- তাকবীর বলার সময়ে দুই হাত কাঁধ বা কান বরাবর উঠাবে।

৩- তাকবীরে তাহরীমার পর ইস্তিফতাহর দু'আ অর্থাৎ এই দু'আ পড়া সুন্নাহ- সুনানে তিরমিযী[১]- ৭৭৬

سُبحانك اللهم وبحمدِكَ وتبارك اسمُك وتعالى جَدك ولا إله غيرُك.

(সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গইরুক।)

তবে চাইলে নিম্নোক্ত দু'আও পড়তে পারে- সহীহ বুখারী- ৭১১

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

(আল্লাহুম্মা বা'ইদ বাইনী ও বাইনা খাতা ইয়ায়া কামা বা'আদতা বাইনাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিব, আল্লাহুম্মা নাক্কিনী মিনাল খাতায়া কামা ইউনাক্কাছ ছাওবুল আবয়াদু মিনাদ দানাস। আল্লাহুম্মাগ সিল খাতা ইয়ায়া বিল মা'ই ওয়াছ ছালজি ওয়াল বারদ।)

[১] মুহাক্কিক বলেন, হাদীসটি সহীহ লিগইরিহি, তবে এই সনদটি হাসান। প্রকা. দারুর রিসালাহ।

৪- এরপর সূরা ফাতিহা পড়বে। সূরা ফাতিহা শেষ করে আমীন বলবে। সূরা ফাতিহা এই-

﴿بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣ مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤ إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٥ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧﴾.

৫- এরপর কোরআনের যে অংশ মুখস্থ আছে এমন অংশ থেকে যতটুকু সহজ মনে হয় পড়বে।

৬- আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবে। পিঠ সোজা রাখবে এবং দুই হাত হাঁটুর ওপর রাখবে। রুকুতে পড়বে سبحان ربي العظيم (সুবহানা রব্বিয়াল আযীম) সুন্নাহ হলো তিনবার বা এর চেয়ে বেশি বলা।

৭- রুকু থেকে سمع الله لمن حمده (সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ) বলে মাথা উঠাবে। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর বলবে-

ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد.

(রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ, হামদান কাছীরান তয়্যিবান মুবারাকান ফীহ, মিল আস সামাওয়াতি ওয়া মিল আল আরদি ওয়া মিল আ মা শি'তা মিন শাই'ইন বা'দু।)

৮- আল্লাহু আকবার বলে সেজদা করবে। সেজদার সময়ে উভয় বাহু উভয় পাশ থেকে এবং উভয় রান উভয় পায়ের গোছা থেকে পৃথক থাকবে। ৭টি অঙ্গের ওপর সেজদা করবে- কপাল (নাকসহ)। দুই হাতের তালু। দুই হাঁটু। দুই পায়ের আঙ্গুলের শুভ্রাংশ। সেজদায় পড়বে سبحان ربي الأعلى (সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা) তিনবার বা এর চেয়ে বেশি এবং নিজ পছন্দমতো দু'আ করবে।

৯- এরপর আল্লাহু আকবার বলে সেজদা থেকে মাথা উঠাবে এবং ডান পা খাড়া করে বাম পায়ের ওপর বসবে। এমতাবস্থায় দুই হাত রাখবে দুই রান ও দুই হাঁটুর ওপর। এ অবস্থায় বলবে-

رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني واجبرني.

(রব্বিগফির লী ওয়ার হামনী ওয়া আ-ফিনী ওয়ার যুকনী ওয়াহ দিনী ওয়াজবুরনী)

১০- তারপর আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সেজদা দিবে। প্রথম সেজদায় যা করেছে এই সেজদায়ও তা করবে। এই সেজদা করার মাধ্যমেই প্রথম রাকাত শেষ হয়ে যাবে।

১১- এরপর আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় রাকাত পড়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে।

১২- এখন সূরা ফাতিহা পড়বে। সূরা ফাতিহা পড়ার পর কোরআন থেকে যে অংশটুকু পড়তে সহজ হয় সে অংশটুকু পড়বে। তারপর রুকু করবে। রুকু থেকে মাথা উঠাবে। এরপর দুই সেজদা করবে। ঠিক যেমন প্রথম রাকাতে করেছে।

১৩- দুই সেজদা করে উঠার পর দুই সেজদার মাঝে যেভাবে বসেছিল ঠিক সেভাবে এখন বসবে এবং তাশাহহুদ পড়বে। সহীহ বুখারী- ১১৪৪। তাশাহহুদ হলো-

التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

সালাত যদি দুই রাকাতবিশিষ্ট হয় যেমন, ফজর, জুম'আ বা ঈদ তাহলে আত্তাহিয়্যাতুর পরও বসে থাকবে এবং নিম্নোক্ত দু'আ পড়ে আত্তাহিয়্যাতুকে পরিপূর্ণ করবে- সহীহ বুখারী- ৩১৯০

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

এরপর চারটি জিনিস থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চেয়ে এই দু'আ পড়বে- সহীহ মুসলিম- ৫৮৮

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

এরপর দুনিয়া ও আখেরাতের যেকোন ভালো জিনিস নিজ ইচ্ছামতো চাইবে, সালাত ফরজ হোক বা নফল। তারপর 'আসসালামু আলাইকুম

ওয়া রহমাতুল্লাহ’ বলে প্রথমে ডান দিকে এবং একই বাক্য পাঠ করে এরপর বাম দিকে সালাম ফিরাবে।

আর যদি সালাত মাগরিবের মতো তিন রাকাতবিশিষ্ট হয় কিংবা যোহর, আসর ও এশার মতো চার রাকাতবিশিষ্ট হয় তাহলে প্রথমে তাশাহহুদ পড়ার পরই আল্লাহু আকবার বলে উঠে দাঁড়াবে এবং দাঁড়িয়ে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে। তারপর প্রথম দুই রাকাতের মতোই পুনরায় রুকু-সেজদা করবে। চতুর্থ রাকাতেও একই কাজ করবে। তবে সেজদা করার পর নিতম্বের ওপর ভর দিয়ে বসবে। ডান পা খাড়া করে রাখবে এবং বাম পা ডান পায়ের নিচে রাখবে। এমতাবস্থায় তার নিতম্ব থাকবে মাটির ওপর। এরপর মাগরিব হলে তিন রাকাতের পর এবং যোহর, আসর ও এশা হলে চার রাকাতের পর শেষবারের মতো তাশাহহুদ পড়বে। রাসুলের ওপর দরুদ পড়বে। চাইলে কিছু দু’আ পড়বে। এরপর ডান দিকে ও বাম দিকে সালাম ফিরাবে যেমনটি ইতোঃপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এরই মাধ্যমে পুরো সালাতের সমাপ্তি হলো।

সালাতের রোকনসমূহ

১- সক্ষমতা থাকা অবস্থায় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা। ২- তাকবীরে তাহরীমা বলা। ৩- সূরা ফাতিহা পাঠ করা। ৪- রুকু করা। ৫- রুকু থেকে ওঠা। ৬- সাত অঙ্গের ওপর সেজদা করা। ৭- এ’তেদাল ঠিক রাখা। অর্থাৎ রুকু সেজদা যথাযথভাবে আদায় করা। ৮- দুই সেজদার মাঝে বসা। ৯- প্রতিটি রোকনে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা। ১০- তারতীব বা সিরিয়াল ঠিক রাখা। ১১- শেষবারের তাশাহহুদ পড়া। ১২- শেষবারের তাশাহহুদের জন্য বসা। ১৩- সালাম ফেরানো।

সালাতের ওয়াজিবসমূহ

১- তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত সকল তাকবীর। ২- রুকুতে سبحان ربي العظيم বলা। ৩- سمع الله لمن حمده বলা। ৪- ربنا ولك الحمد বলা। ৫- সেজদায় سبحان ربي الأعلى বলা। ৬- দুই সেজদার মাঝে رب اغفر لي বলা। ৭- প্রথম

বৈঠকের তাশাহহুদ পড়া। ৮- তাশাহহুদের জন্য প্রথম বৈঠক করা। ৯- রাসুলের ওপর দরূদ পড়া।

মানুষের স্বভাব হলো জীবনে ভুল করা ও ভুলে যাওয়া। তাই আমরা (সালাতে) ভুল করা ও এর জন্য সেজদা দেওয়া অর্থাৎ সেজদায় সাহু সংক্রান্ত মাসআলাসমূহ বর্ণনা করব।

সেজদায় সাহুর কিছু মাসআলা

একজন মুসলিমকে অবশ্যই জানতে হবে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে সালাতের কোন রোকন বা ওয়াজিব তরক করলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। তবে সেজদায় সাহু দেওয়ার কারণ হলো, সালাতের মাঝে কোন কিছু কমবেশি করা বা সন্দেহে পতিত হওয়া।

সালাতে কোন কাজ কম করার কিছু মাসআলা-

১- কোন রোকন ছুটে যাওয়া। মুসল্লী ব্যক্তির ছুটে যাওয়া রোকনটি যদি তাকবীরে তাহরীমা হয় তাহলে তার সালাতই হবে না। ইচ্ছে করে ছেড়ে দিক বা ভুলবশতঃ কোন অবস্থাতেই সালাত হবে না। কারণ এক্ষেত্রে তার সালাত শুরুই হয়নি।

আর যদি রোকনটি তাকবীরে তাহরীমা না হয় তাহলে যদি ইচ্ছে করে তা ছেড়ে দেয় তবেই তার সালাত বাতিল হবে।

তবে যদি কোন রোকন ভুলবশতঃ ছেড়ে দেয় এবং পরের রাকাতের ঐ একই রোকন আদায়ের সময় হয়ে যায় তাহলে তার প্রথম রাকাতটি বাতিল হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় রাকাতটি এখন প্রথম রাকাতের স্থলবর্তী হয়ে যাবে।

তবে ভুল করে রোকন ছেড়ে দেওয়ার পর যদি এখনো দ্বিতীয় রাকাতের ঐ একই রোকনের স্থানে না পৌঁছয় তাহলে তার ওপর আবশ্যক হলো, ছেড়ে আসা রোকনটি তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করে নেয়া এবং এরপর থেকে সালাত আদায় চালিয়ে যাওয়া।

তবে উপরিউক্ত (ভুলবশতঃ ছেড়ে দেওয়ার) উভয় সুরতে মুসল্লী ব্যক্তির ওপর আবশ্যক হলো, সালাম ফেরানোর পর সেজদায় সাহু করে নেয়া।

২- কোন ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দেওয়া। মুসল্লী ব্যক্তি যদি সালাতের কোন ওয়াজিব কাজ ইচ্ছে করে ছেড়ে দেয় তাহলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি সে ওয়াজিব কাজটি করতে ভুলে যায়, কিন্তু ঐ কাজটি আদায় করার স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই যদি মনে পড়ে যায় তাহলে এক্ষেত্রে সে ওয়াজিব কাজটি আদায় করে নিবে; সেজদায় সাহু দেওয়ার প্রয়োজন

নেই। তবে যদি ওয়াজিব কাজটি আদায় করার স্থান ত্যাগ করার পর এবং পরবর্তী রোকনে পৌঁছার পূর্বেই ওয়াজিব কাজটির কথা মনে পড়ে যায় তাহলে সে উক্ত ওয়াজিব কাজটির পর্যায়ে ফিরে এসে ওয়াজিবটি আদায় করে নিবে এবং সালাত শেষ করে সেজদায় সাহু দিবে। এক্ষেত্রে মুসল্লী ব্যক্তি যদি পরবর্তী রোকনে উপনীত হয়ে যায় তাহলে ওয়াজিবটি তার ওপর থেকে রহিত হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তার কর্তব্য হলো সালাত চালিয়ে যাওয়া এবং সালাম ফেরানোর পূর্বেই সেজদায় সাহু আদায় করা।

সালাতে অতিরিক্ত কোন কাজ করার কিছু মাসআলা-

মুসল্লী ব্যক্তি যদি সালাতে ইচ্ছাকৃতভাবে দণ্ডায়মান থাকা, বসা, রুকু ও সেজদা করা ইত্যাদি কোন একটি কাজ অতিরিক্ত করে তাহলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি সে ভুলে গিয়ে এমন কাজ করে থাকে এবং সালাত শেষ হওয়ার পূর্বে ভুলের বিষয়টি স্মরণ না হয় তাহলে (সালাতশেষে স্মরণ হলে) সে সেজদায় সাহু করে নিবে এবং তার সালাত হয়ে যাবে। আর যদি সে অতিরিক্ত কাজটি করার মাঝেই বিষয়টি উপলব্ধি করে তাহলে অবশ্যই তাকে এই কাজটি থেকে ফিরে আসতে হবে এবং সেজদায় সাহু ওয়াজিব হবে। এমতাবস্থায় তার সালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে।

সালাত শেষ হওয়ার পূর্বেই সালাম ফেরানো সালাতের মধ্যে অতিরিক্ত কোন কাজ করার শামিল। তো মুসল্লী ব্যক্তি যদি সালাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ইচ্ছাকৃতভাবে সালাম ফেরায় তাহলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু সে যদি ভুলে গিয়ে এমন কাজ করে থাকে এবং ভুলের বিষয়টি অনেক পরে গিয়ে মনে পড়ে তাহলে তাকে নতুন করে সালাতটি আদায় করতে হবে। তবে যদি দুই/তিন মিনিটের মতো অল্প সময় পরে তার বিষয়টি উপলব্ধি হয় তাহলে সে সালাত শেষ করবে এবং সালাম ফেরাবে। এরপর সে সেজদায় সাহু করে পুনরায় সালাম ফেরাবে।

ইমাম সাহেব যদি সালাত শেষ হওয়ার পূর্বেই সালাম ফিরিয়ে ফেলেন এবং মুক্তাদীদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে যার সালাতের কিছু অংশ ফওত হয়ে গিয়েছে এবং তিনি বাকি সালাত আদায় করার জন্য দাঁড়িয়ে যান তারপর ইমাম সাহেবের যদি মনে পড়ে যে তার সালাত এখনো কিছু

বাকি আছে তাই তিনি সালাতের বাকি অংশ আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে যান তাহলে যে (মাসবুক) মুক্তাদী তার সালাতের বাকি অংশ আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন তার সামনে দুইটি সুযোগ রয়েছে-

১- তিনি তার বাকি সালাত আদায় করে যাবেন এবং সেজদায় সাহু দিবেন কিংবা

২- ইমাম সাহেবকে অনুসরণ করবেন এবং ইমাম সাহেব সালাম ফেরালে তিনি তার অবশিষ্ট সালাত আদায় করবেন এবং (মুক্তাদী) সালাম ফেরানোর পর সেজদায় সাহু করবেন। এটিই অধিক উত্তম ও সতর্কতার দাবি।

সালাতে সন্দেহে পতিত হওয়ার কিছু মাসআলা-

সন্দেহ হলো, যেকোন দুইটি ব্যাপারে এই দ্বিধায় পড়া যে, কোনটি ঘটেছে। ইবাদাত করতে গিয়ে তিনটি অবস্থায় কোন সন্দেহকে গুরুত্ব দেওয়া হবে না-

- যদি এটি কেবল একটি ওহম বা ভ্রম হয়, যার কোন বাস্তবতা নেই। যেমন, ওয়াসওয়াসা।
- যদি সন্দেহে পতিত হওয়ার ঘটনা বেশি পরিমাণে হয় এভাবে যে, যেকোন ইবাদাত করলেই সন্দেহ তৈরি হয়।
- যদি সন্দেহ ইবাদাত থেকে ফারেগ হওয়ার পরে তৈরি হয়। এক্ষেত্রে ইয়াক্বীন বা পূর্ণ বিশ্বাস না হলে এমন সন্দেহকে গুরুত্ব দেওয়া যাবে না। যদি ইয়াক্বীন হয় তাহলে তখন যে ব্যাপারে ইয়াক্বীন হবে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে।

তবে এই তিনটি প্রেক্ষাপট ব্যতীত অন্য প্রেক্ষাপটে সন্দেহ তৈরি হলে তা গুরুত্ব দিতে হবে। সালাতে সন্দেহ তৈরি হওয়ার দুইটি সুরত হতে পারে। ১- প্রথম সুরত হলো, দুই ব্যাপারের মধ্যে যেকোন একটি ব্যাপার মুসল্লী ব্যক্তির নিকট সঠিক মনে হওয়া। এক্ষেত্রে যে ব্যাপারটি সঠিক মনে হবে তার ওপর আমল করবে। এভাবে সালাত শেষ করে সালাম ফেরাবে এবং সেজদায় সাহু করে আবার সালাম ফেরাবে।

২- দ্বিতীয় সুরত হলো, দুইটি ব্যাপারের কোন ব্যাপারই সঠিক মনে না হওয়া। এক্ষেত্রে যে ব্যাপারটি সুনিশ্চিত সে অনুযায়ী আমল করবে। আর সুনিশ্চিত ব্যাপারটি হলো, দুইটি ব্যাপারের মধ্যে যেটি কম বা স্বল্প[১]। সুতরাং এর ওপর ভিত্তি করে সালাত শেষ করবে এবং সেজদায় সাহু করবে।

মুক্তাদীর জন্য সেজদায় সাহু

ইমাম সাহেব যদি ভুল করেন তাহলে মুক্তাদীর জন্যও ওয়াজিব হলো সেজদায় সাহুর ক্ষেত্রে ইমাম সাহেবকে অনুসরণ করা। কারণ নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ.

"ইমামকে নির্ধারণ করা হয়েছে তাকে অনুসরণ করার জন্য, সুতরাং তোমরা তার বিপরীত কাজ করো না।" এই হাদীসের এক পর্যায়ে নবী সা. বলেন,

وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا.

"তিনি যখন সেজদা দিবেন তখন তোমরাও সেজদা দিবে।" সহীহ বুখারী-৩৭১।

ইমাম সাহেব সেজদায় সাহু সালাম ফেরানোর পূর্বে দিক বা আগে দিক উভয় অবস্থাতেই মুক্তাদী তাকে অনুসরণ করবে। তবে যদি মুক্তাদী মাসবুক হয় অর্থাৎ যার সালাতের কিছু অংশ ছুটে গেছে তাহলে তিনি 'সালামপরবর্তী সেজদায় সাহু' এর ক্ষেত্রে তাকে অনুসরণ করবে না যেহেতু এক্ষেত্রে তাকে অনুসরণ করা অসম্ভব। কারণ মাসবুকের পক্ষে তো ইমামের সঙ্গে সালাম ফেরানো সম্ভব নয়। সুতরাং অবস্থা এমন হলে তিনি তার অবশিষ্ট সালাত আদায় করে সালাম ফেরাবেন এবং সেজদায় সাহু করে পুনরায় সালাম ফেরাবেন।

তবে যদি ইমাম নয়; বরং মুক্তাদী সালাতে ভুল করে যে মুক্তাদীর সালাতের কোন অংশ ছুটে যায়নি অর্থাৎ সে মাসবুক নয় তাহলে এক্ষেত্রে তাকে কোন সেজদায় সাহু করা লাগবে না। কারণ মুক্তাদি এই সুরতে সেজদায়

---

[১] যেমন, দ্বিতীয় সেজদা করেছে কিনা এ ব্যাপারে এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে দ্বিতীয় সেজদা করে নিবে। কারণ এক্ষেত্রে ১ম সেজদা যে সে করেছে তা সুনিশ্চিত।

সাহু করতে গেলে ইমামের সঙ্গে তিনি ইখতেলাফে লিপ্ত হয়ে যাবেন এবং ইমামের অনুসরণে বিঘ্নতা সৃষ্টি হবে। এছাড়াও আরেকটি কারণ হলো, নবী সা. যখন প্রথম তাশাহহুদ পড়তে ভুলে গিয়েছিলেন তখন সাহাবায় কেরামও তাশাহহুদ পরা ত্যাগ করে তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। তারা কিন্তু তাশাহহুদ পরার জন্য বসে যাননি। এর কারণ হলো, তারা ইমামের অনুসরণ করা এবং তার সঙ্গে ইখতেলাফে লিপ্ত না হওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়েছেন।

তবে যদি মুক্তাদী মাসবুক হয় এবং ইমামের সঙ্গে থাকা অবস্থায় বা পরবর্তী সালাত আদায় করার সময়ে তিনি কোন ভুল করেন তাহলে তার ওপর থেকে সেজদায় সাহু রহিত হবে না। সুতরাং তিনি সালাত শেষে ওপরে উল্লিখিত বিস্তারিত আলোচনা অনুযায়ী সালামের আগে কিংবা পরে সেজদায় সাহু করে নিবেন।

জামাতের সালাত

সহীহ বুখারীতে আছে, ইবনে ওমর রা. রসুলুল্লাহ সা. হতে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন,

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

"একাকী সালাত আদায়ের চেয়ে জামাতে সালাত আদায় করা ২৭ গুণ বেশি সওয়াব।" সহীহ বুখারী- ৬১৯। আরেকটি হাদীসে নবী সা. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ.

"আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, সালাত কায়েম করার আদেশ করব। তারপর যে সম্প্রদায় জামাতের সালাতে উপস্থিত হয় না, আমি তাদের বাড়ি গিয়ে তাদের মাথার ওপর তাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিবো।" সহীহ বুখারী- ২২৮৮। তো যদি ওই সকল লোকের জামাতের সালাতে অনুপস্থিত থাকাটা কবীরা গুনাহ না হতো তাহলে নবী সা. তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দিতেন না। এছাড়াও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন,

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ ارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ.

{তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু করো।} আল বাকারা- ৪৩। মুসলিমদের সঙ্গে জামাতে সালাত আদায় করা যে ওয়াজিব তা উক্ত আয়াতে স্পষ্ট।

জুম'আর সালাত

ইসলাম ধর্ম মানুষকে একতাবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করে এবং আহ্বান জানায়। পাশাপাশি বিচ্ছিন্নতাকে ঘৃণা করে এবং এ ব্যাপারে ঘৃণা তৈরি করে। মুসলিমদের পরস্পরের মাঝে পরিচিতি লাভ, সম্প্রিতি সৃষ্টি ও একতাবদ্ধ হওয়ার এমন কোন ক্ষেত্র ইসলাম বাকি রাখেনি, যেদিকে ইসলাম মানুষকে আহ্বান করেনি এবং যা পালন করতে মানুষকে আদেশ করেনি।

জুম'আর দিন হলো মুসলিমদের জন্য ঈদের দিন। এদিন মুসলিমগণ আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর বড়ত্ব ঘোষণার মজলিসে ছুটে যান। আল্লাহর একটি ফরজ সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে এবং খতীব ও আলেমগণের দিক-নির্দেশনা শ্রবণের জন্য তারা দুনিয়ার যাবতীয় ব্যস্ততার শৃঙ্খল হতে মুক্ত হয়ে আল্লাহর ঘরে একত্রিত হন। জুম'আর খুতবায় তারা দ্বীনী শিক্ষা লাভ করেন। এই দিন দুইটি খুতবা হয়। দুই খুতবার মাঝে খতীব সাহেব এক মুহূর্তের জন্য বসেন। এটি একটি সাপ্তাহিক সমাবেশের মতো। উক্ত খুতবাদ্বয়ে খতীব সাহেব শ্রোতাদের নিকট আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তাদের অন্তরকে জাগ্রত করেন এবং তাদের হৃদয়মাঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভালোবাসা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের আবশ্যকতা জাগ্রত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

{হে ঐ সকল লোক যারা ঈমান এনেছো! যখন জুমু'আর দিনে সালাতের জন্য আহবান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও। আর বেচা-কেনা বর্জন কর। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে। অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো আর আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং আল্লাহকে

বেশি বেশি স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।} আল জুম'আ- ০৯-১০

প্রত্যেক মুসলিম, বালেগ, স্বাধীন ও মুসাফির নয় এমন ব্যক্তির ওপর জুম'আর সালাত আদায় করা ওয়াজিব। নবী সা. সর্বদা জুম'আর সালাত আদায় করেছেন এবং যারা জুম'আর সালাত আদায় করে না তাদের ব্যাপারে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ. أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ. ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ.

"কিছু লোক হয় জুম'আর সালাত ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকবে আর নয়তো আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিবেন তারপর তারা কিন্তু গাফেলদের কাতারে পড়ে যাবে।" সহীহ মুসলিম- ৮৬৫। তিনি আরো বলেন,

مَنْ تركَ ثلاث جُمَعٍ تهاوناً بها، طَبَعَ الله على قَلْبِهِ.

"যে ব্যক্তি গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে তিনটি জুম'আ পরিত্যাগ করবে আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দিবেন।" আবু দাউদ[১]- ১০৫২।

জুম'আর সালাত হলো দুই রাকাত। একজন মুসলিম ব্যক্তি মুসলিমদের জামাতের সাথে ইমামের ইক্তেদা করে এই দুই রাকাত সালাত আদায় করবে। জুম'আর সালাত জামাত ব্যতীত আদায় করা সহীহ নয়। যে জামাতে মুসলিমগণ একত্রিত হবে। তাদের ইমাম তাদের মাঝে খুতবা প্রদান করবেন এবং তাদেরকে নাসীহা ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন। খুতবা চলাকালীন সময়ে কথা বলা হারাম। এমনকি আপনি যদি আপনার পাশেরজনকে বলেন, সস... বা 'চুপ থাকুন' তাহলে আপনিও অনর্থক কাজ করলেন বলে গণ্য হবে।

একটি মাসআলা- কেউ যদি জুম'আর এক রাকাত না পায় তাহলে বিশুদ্ধ মত হলো, তিনি যোহর হিসেবে সালাত শেষ করবেন।

---

[১] মুহাক্কিক বলেন, হাদীসটি সহীহ লিগইরিহী, তবে এটি একটি হাসান সনদ। প্রকা. দারুর রিসালাহ।

মুসাফিরের সালাত

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

{আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান; তিনি তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না।} আল বাকারা- **১৮৫**। ইসলাম এমনই একটি সহজ ধর্ম। তাই আল্লাহ সামর্থের বাইরে কোন নফসের ওপর কোন কিছু চাপিয়ে দেন না। আল্লাহ কোন নফসকে এমন কোন আদেশ করেন না, যা সে করার সামর্থ রাখে না। যেহেতু সফরে কষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে, সেহেতু আল্লাহ সফরাবস্থায় দুইটি বিষয়ে রুখসত দিয়েছেন-

প্রথম রুখসত- সালাত কসর করা। অর্থাৎ চার রাকাতবিশিষ্ট সালাত ২ রাকাত করে আদায় করা। সুতরাং আপনি যখন সফরে থাকবেন তখন আপনি যোহর, আসর ও এশার সালাত চার রাকাতের বদলে দুই রাকাত আদায় করুন। তবে মাগরিব ও ফজরের সালাত আপন অবস্থায় বহাল থাকবে। এই দুই সালাতে কোন কসর নেই। সালাত কসর করা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি রুখসত ও সহজায়ন। বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর রুখসতগুলো গ্রহণ করা তিনি ভালোবাসেন, ঠিক যেমন বান্দার পক্ষ থেকে তাঁর রুখসতহীন আমলগুলো পালন করাও তিনি ভালোবাসেন। সফর গাড়িতে হোক বা বিমানে, জাহাজে, ট্রেনে কিংবা জন্তু-জানোয়ারের পিঠে সওয়ার হয়ে বা পায়ে হেঁটে সবই সমান। সব ক্ষেত্রেই সালাত কসর করা হবে, যতক্ষণ না তা কোন গোনাহের জন্য সফর হয়।

দ্বিতীয় রুখসত- জমা' বাইনাস সালাতাইন বা দুই সালাত একসঙ্গে পড়া। সুতরাং একজন মুসাফিরের জন্য একই ওয়াক্তে দুই সালাত একসঙ্গে পড়া জায়েজ আছে। এভাবে সে যোহর ও আসর একসঙ্গে পড়বে এবং মাগরিব ও এশাও একসঙ্গে পড়বে। এভাবে দুইটি সালাতের ওয়াক্ত একটি ওয়াক্তে পরিণত হবে। ঐ একটি ওয়াক্তেই দুইটি সালাত আদায় করা হবে। প্রত্যেক সালাত অপর সালাত থেকে আলাদা হবে। যেমন যোহরের সালাত আদায় করে এর পরপরই আসরের সালাত আদায় করবে। অথবা মাগরিবের সালাত আদায় করার পরই এশার সালাত আদায় করবে। তবে এই জমা

করার রুখসতটি যোহর-আসর ও মাগরিব-এশার জন্যই প্রযোজ্য। সুতরাং ফজর ও যোহর এবং আসর ও মাগরিব এভাবে জমা করা জায়েজ নেই।

সুন্নাহসম্মত কিছু দু'আ বা যিকির

মুসল্লী ব্যক্তির জন্য সালাতের পর তিনবার এস্তেগফার করা সুন্নাহ। তিনি এই দু'আও পড়বেন-

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

৩৩ বার তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর বলবে। অর্থাৎ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ বলবে। একশতম বারে গিয়ে বলবে, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ এবং সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়বে। ফজর ও মাগরিবের পর এই সূরাগুলো তিনবার করে পড়া মুস্তাহাব। পাশাপাশি ওপরে উল্লিখিত যিকর ও দু'আ শেষ করে ফজর ও মাগরিবের পর এই দু'আটিও ১০ বার পড়া মুস্তাহাব-

لا إله إلا الله وحدَه، لا شريكَ له، له الملكُ، وله الحمدُ، يُحيي ويُميت وهو على كلِّ شيءٍ قدير.

এই সবগুলো যিকরই সুন্নাহ; ফরজ নয়।

নিয়মিত কিছু সুন্নাহ সালাত

মুসাফির না হলে একজন মুসলিম নর-নারীর ওপর প্রতিদিন ১২ রাকাত সালাত আদায়ে যত্নবান হওয়া মুস্তাহাব। এই ১২ রাকাত সালাত হলো- যোহরের পূর্বে ৪ রাকাত। যোহরের পর ২ রাকাত। মাগরিবের পর ২ রাকাত। এশার পর ২ রাকাত এবং ফজরের পূর্বে ২ রাকাত। উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবাহ রমলাহ বিনতে আবু সুফইয়ান রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সা.কে বলতে শুনেছি যে,

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ – أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ.

"যদি কোন মুসলিম বান্দা প্রতিদিন ফরজ সালাত ব্যতীত ১২ রাকাত নফল সালাত আল্লাহর জন্য আদায় করে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করে দিবেন" কিংবা তিনি বলেছেন **"তার জন্য অবশ্যই জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে।"** সহীহ মুসলিম- ৭২৮। তবে সফরাবস্থায় রসুলুল্লাহ সা. যোহর, মাগরিব ও এশার সুন্নাহ সালাত ছেড়ে দিতেন, তবে ফজরের সুন্নাহ ও বিতরের প্রতি যত্নবান থাকতেন। আর আমাদের জন্য রসুলুল্লাহ সা. এর মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

{অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ।} আল আহযাব- ২১। রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, **"তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছো সেভাবেই সালাত আদায় করো।"** সহীহ বুখারী- ৫৬৬২

এর মধ্য দিয়ে আল্লাহর হুকুমে আমরা ইসলামের দ্বিতীয় রোকন ও এ সংক্রান্ত কিছু মাসআলা শেষ করলাম।

ইসলামের তৃতীয় রোকন হলো,

যাকাত প্রদান করা

যাকাতের **আভিধানিক** অর্থ হলো, বৃদ্ধি পাওয়া।

পারিভাষিক অর্থে যাকাত হলো, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষের জন্য নির্দিষ্ট মাল থেকে ওয়াজিব হক্ব প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাত করা।

যাকাতের হুকুম- আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান ও সালাত আদায়ের পর যাকাত হলো ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রোকন। এটি ইসলামের তৃতীয় রোকন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ط وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

{আপনি তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ করুন। এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন। আর আপনি তাদের জন্য দু'আ করুন। আপনার দু'আ তো তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।} আত তাওবাহ- **১০৩**

যাকাত কবে ফরজ হয়েছে?

যাকাত মক্কায় ফরজ হয়েছে। তবে যাকাতের নেসাব, কোন ধরণের সম্পদ থেকে যাকাত প্রদান করা হবে এবং কাদেরকে যাকাত দেওয়া হবে ইত্যাদি বিষয় হিজরী দ্বিতীয় সনে মদীনায় নাযিল হয়েছে।

যাকাতের শর্তসমূহ-

মুসলিম হওয়া। স্বাধীন হওয়া (অর্থাৎ দাস/দাসী না হওয়া)। নেসাবের পরিপূর্ণ ও স্থিতিশীল মালিকানা অর্জিত হওয়া। সম্পদের ওপর এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া। (এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি চতুষ্পদ জন্তু, স্বর্ণ-রূপা ও ব্যবসায়িক পণ্যের সঙ্গে খাস।)

যেসমস্ত সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয়-

১- চতুষ্পদ জন্তু (উট, গরু, বকরি)। ২- স্বর্ণ-রূপা। ৩- ব্যবসায়িক পণ্য। ৪- ফসল ও ফল-ফলাদি। ৫- খনিজসম্পদ।

যাকাতের হক্বদার কারা?

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَ الۡمَسٰكِیۡنِ وَ الۡعٰمِلِیۡنَ عَلَیۡهَا وَ الۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوۡبُهُمۡ وَ فِی الرِّقَابِ وَ الۡغٰرِمِیۡنَ وَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ وَ ابۡنِ السَّبِیۡلِ ؕ فَرِیۡضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِیۡمٌ حَكِیۡمٌ.

{সাদাকা তো শুধু ফকীর, মিসকীন ও সাদাকা আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তিতে, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।} আত তাওবাহ- ৬০

মাসআলা-

সঠিক মত অনুযায়ী গুপ্তধন গনীমতের মালের হুকুমে। অনুরূপ মত পোষণ করেছেন আবু হানীফা রহ. ও মালেক রহ.। ইমাম আহমদ রহ. এর মাযহাবের একটি মত এটির অনুরূপ, যা ইবনে কুদামা রহ. সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। এই মতটির দলীল হলো,

عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ أَلْفَ دِينَارٍ مَدْفُونَةً خَارِجًا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَتَى بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَخَذَ مِنْهَا الْخُمُسَ مِائَتَيْ دِينَارٍ، وَدَفَعَ إِلَى الرَّجُلِ بَقِيَّتَهَا، وَجَعَلَ عُمَرُ يَقْسِمُ الْمِائَتَيْنِ بَيْنَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَى أَنْ أَفْضَلَ مِنْهَا فَضْلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: «أَيْنَ صَاحِبُ الدَّنَانِيرِ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: خُذْ هَذِهِ الدَّنَانِيرَ فَهِيَ لَكَ.

শা’বী রহ. হতে বর্ণিত আছে যে, ‘এক ব্যক্তি মদীনার বাইরে এক হাজার দিনার মাটির নিচে দাফনকৃত অবস্থায় পেয়ে এই মাল সে ওমর রা. এর নিকট নিয়ে এলো। ওমর রা. সেখান থেকে খুমুস হিসেবে দুইশত দিনার নিয়ে বাকিটুকু লোকটিকে ফিরিয়ে দিলেন। ওমর রা. এই দুইশত দিনার তাঁর সামনে উপস্থিত মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করতে লাগলেন এবং এক পর্যায়ে কিছু দিনার বেঁচে গেলো। এমতাবস্থায় তিনি বললেন, দিনারওয়ালা লোকটি কোথায়? তখন লোকটি ওমর রা. এর সামনে এলে ওমর রা.

বললেন, এই দিনারগুলো তুমি নিয়ে যাও, এগুলো তোমার জন্য[১]।' আল আমওয়াল- আবু উবাইদ আল কাসিম ইবনে সাল্লাম।

এখানে লক্ষ্যণীয় হলো, এই সম্পদ যদি যাকাত হতো তাহলে ওমর রা. যাকাতের নির্দিষ্ট হক্কদারদেরকেই তা দান করতেন; এর কিছু অংশ পুনরায় তিনি সম্পদটি যিনি পেয়েছেন তাকে প্রদান করতেন না।

কোন সম্পদ কতটুকু হলে কতটুকু যাকাত দিতে হবে এবং যাকাতের হিসাব কীভাবে করা হবে নিম্নে এ সংক্রান্ত একটি নকশা দেওয়া হলো-

---

[১] এই বর্ণনাটি দুর্বল।

তবে গুপ্তধনে যে খুমুস প্রদান করতে হয় এ ব্যাপারে সহীহ হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো, আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত যে, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন,

الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

“চতুষ্পদ জন্তুর আঘাত দায়মুক্ত, কূপ (খননে শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক) দায়মুক্ত, খণি (খননে কেউ মারা গেলে মালিক) দায়মুক্ত। রিকাযে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।” সহীহ বুখারী- ৬৫১৪

<table>
<tr><th colspan="2">সম্পদের প্রকার</th><th>নেসাবের পরিমাণ</th><th>কতটুকু যাকাত দিবে</th><th colspan="3">যাকাত হিসাব করার পদ্ধতি</th></tr>
<tr><td colspan="2">স্বর্ণ</td><td>৮৫ গ্রাম</td><td>২.৫%</td><td colspan="3">স্বর্ণের পরিমাণ × ২.৫ ÷ ১০০</td></tr>
<tr><td colspan="2">রূপা</td><td>৫৯৫ গ্রাম</td><td>২.৫%</td><td colspan="3">রূপার পরিমাণ × ২.৫ ÷ ১০০</td></tr>
<tr><td colspan="2">টাকা-পয়সা</td><td>৮৫ গ্রাম স্বর্ণের মূল্য পরিমাণ</td><td>২.৫%</td><td colspan="3">অর্থের পরিমাণ × ২.৫ ÷ ১০০</td></tr>
<tr><td colspan="2">ব্যবসায়িক মালামাল</td><td>৮৫ গ্রাম স্বর্ণের মূল্য পরিমাণ</td><td>২.৫%</td><td colspan="3">ব্যবসায়িক মালামালের মূল্য × ২.৫ ÷ ১০০</td></tr>
<tr><td colspan="2">শেয়ার</td><td>৮৫ গ্রাম স্বর্ণের মূল্য পরিমাণ</td><td>২.৫%</td><td colspan="3">শেয়ারের বাজারদর × ২.৫ ÷ ১০০</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ফসলাদি</td><td>মেশিন দিয়ে পানি দেওয়া</td><td>প্রায় ৬১৫ কেজি</td><td>৫%</td><td colspan="3">ফসলের পরিমাণ × ৫ ÷ ১০০</td></tr>
<tr><td>মেশিন ছাড়া পানি দেওয়া</td><td>প্রায় ৬১৫ কেজি</td><td>১০%</td><td colspan="3">ফসলের পরিমাণ × ১০ ÷ ১০০</td></tr>
<tr><td rowspan="18">গবাদিপশু</td><td rowspan="6">ছাগল, ভেড়া, দুম্বা</td><td rowspan="6">৪০টি</td><td>পশুর সংখ্যা</td><td colspan="3">যাকাতে কয়টি আসবে</td></tr>
<tr><td>৪০-১২০</td><td colspan="3">১টি ছাগল</td></tr>
<tr><td>১২১-২০০</td><td colspan="3">২টি ছাগল</td></tr>
<tr><td>২০১-৩০০</td><td colspan="3">৩টি ছাগল</td></tr>
<tr><td>৩০০ এর ওপরে</td><td colspan="3">প্রতি ১০০টি ছাগলে ১টি ছাগল</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td rowspan="12">উট কিংবা গরু</td><td rowspan="12">৫টি</td><td>৫-৯</td><td colspan="3">একটি বকরি (ছাগল হলে যার বয়স ১ বছর এবং ভেড়া হলে ৬ মাস)</td></tr>
<tr><td>১০-১৪</td><td colspan="3">২টি ছাগল</td></tr>
<tr><td>১৫-১৯</td><td colspan="3">৩টি ছাগল</td></tr>
<tr><td>২০-২৪</td><td colspan="3">৪টি ছাগল</td></tr>
<tr><td>পশুর সংখ্যা</td><td>উট</td><td>গরু</td><td>অর্থ</td></tr>
<tr><td>২৫-৩৫</td><td>১টি বিনতে মাখায</td><td>১টি জাযা'আ</td><td>১ বছর বয়সী</td></tr>
<tr><td>৩৬-৪৫</td><td>১টি বিনতে লাবুন</td><td>১টি ছানিয়্যা</td><td>২ বছর বয়সী</td></tr>
<tr><td>৪৬-৬০</td><td>১টি হিক্কাহ</td><td>১টি রুবা'ইয়্যাহ</td><td>৩ বছর বয়সী</td></tr>
<tr><td>৬১-৭৫</td><td>১টি জাযা'আ</td><td>১টি সুদাইস</td><td>৪ বছর বয়সী</td></tr>
<tr><td>৭৬-৯০</td><td>২টি বিনতে লাবুন</td><td colspan="2">২টি ছানিয়্যা</td></tr>
<tr><td>৯১-১২০</td><td>২টি হিক্কাহ</td><td colspan="2">২টি রুবা'ইয়্যাহ</td></tr>
<tr><td>এরচেয়ে বেশি হলে</td><td colspan="3">প্রতি ৪০টিতে ১টি ২ বছর বয়সী এবং প্রতি ৫০টিতে ১টি ৩ বছর বয়সী প্রদান করতে হবে।</td></tr>
</table>

ইসলামের চতুর্থ রোকন হলো,

সিয়াম রাখা

সিয়ামের সংজ্ঞা

আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সিয়ামের নিয়ত করে ফজরের সালাতের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর থেকে সূর্য ডোবার আগ পর্যন্ত খাবার খাওয়া থেকে, পান করা, সহবাস করা এবং সিয়ামভঙ্গকারী সকল বিষয় থেকে বিরত থাকার নাম হলো সিয়াম।

সিয়ামের হুকুম

রামাদানের সিয়াম হলো ইসলামের চতুর্থ রোকন। আল্লাহ সিয়ামকে সম্মানিত ও মহান হিসেবে তুলে ধরার জন্য তিনি তা নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন[১]। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা হিজরী দ্বিতীয় বর্ষে সিয়াম ফরজ করেছেন। রসুলুল্লাহ সা. নয়টি রামাদান সিয়াম রেখেছেন। যদি কেউ সিয়াম ভেঙ্গে ফেলে তাহলে তার কবীরা গোনাহ হবে। বরং কোন কোন আলেম মনে করেন, তা কুফরীও হয়ে যেতে পারে।

সিয়াম কার কার ওপর ফরজ?

রামাদানের সিয়াম প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, বোধসম্পন্ন, সিয়াম রাখতে সক্ষম ও মুসাফির নয় এমন মুসলিম ব্যক্তির ওপর ফরজ। হোক সে পুরুষ কিংবা নারী। তবে সিয়াম রাখার প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত থাকাও শর্ত, যেমন হায়েজ-নেফাস। তবে এটি নারীদের সঙ্গে খাস।

আল্লাহ পূর্ববর্তী উম্মাহর ওপর যেমন সিয়াম ফরজ করেছেন তেমনি এই উম্মাহর ওপরও সিয়াম ফরজ করেছেন। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

{হে মুমিনগণ, তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।} আল বাকারা- **১৮৩**

---

[১] যেমন, সহীহ হাদীসে আছে, الصوم لي অর্থাৎ সিয়াম আমার জন্য।

যেসমস্ত কারণে সিয়াম ভঙ্গ হয়-

- সিয়াম অবস্থায় পানাহার করলে।
- সিয়াম অবস্থায় সহবাস করলে।
- জাগ্রত অবস্থায় সহবাস, চুম্বন, হস্তমৈথুন কিংবা অন্য কোন উপায়ে বীর্য বের করলে।
- সিয়াম অবস্থায় পুষ্টিযোগায় এমন কোন ইঞ্জেকশন গ্রহণ করলে। কেউ যদি ইচ্ছে করে জেনে-শুনে সিয়ামের কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় উপরোল্লিখিত কাজগুলো সম্পাদন করে তাহলে তার সিয়াম ভঙ্গ হবে।
- সিয়ামরত অবস্থায় হায়েজ-নেফাসের রক্ত বের হলে।
- মুরতাদ হয়ে গেলে।

একটি মাসআলা- কেউ যদি সিয়ামরত অবস্থায় ভুলে পানাহার করে ফেলে তাহলে কোন সমস্যা নেই। কারণ মূলতঃ আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন, যেমনটি নবী সা. বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীসে বলেছেন।

রামাদান মাসে সিয়াম ভঙ্গ করার কিছু বৈধ ওজর-

- অসুস্থতা ও বার্ধক্য।
- মুসাফির হওয়া।
- গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিনী হওয়া।
- হায়েজ-নেফাস। এসময়ে একজন নারীর জন্য সিয়াম পালন করা হারাম।

সিয়ামরত অবস্থায় সহবাসের মাধ্যমে সিয়াম ভঙ্গ করলে কী কাফফারা আসবে?

এমতাবস্থায় কাফফারা হলো, একটি দাস/দাসী আযাদ করা। যদি কোন দাস/দাসী না পাওয়া যায় তাহলে সে লাগাতার দুই মাস সিয়াম রাখবে। যদি তাও করতে না পারে তাহলে ষাটজন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে।

প্রত্যেক মিসকিনের জন্য অর্ধ সা'[১] পরিমাণ খাবার ধার্য থাকবে। যদি তাও না পারে তাহলে কাফফারা রহিত হয়ে যাবে। তবে সিয়াম পালন করা ফরজ এমন কোন ব্যক্তি যদি সহবাস ব্যতীত অন্য কোন কারণ সংঘটিত করে তাহলে তার ওপর এই কাফফারা ওয়াজিব হবে না, যদিও সে জেনে-শুনে ও ইচ্ছাকৃতভাবে তা করে। আবার কেউ যদি নফল, মান্নত কিংবা কাজা সিয়ামের ক্ষেত্রে সহবাসের মাধ্যমে সিয়াম ভঙ্গ করে তাহলে তার ওপরও এমন কাফফারা আসবে না।

যেসমস্ত কারণে সিয়াম ভঙ্গ হয় না সেগুলোর সংখ্যা অনেক। তবে এর মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ-

১- সুরমা লাগানো। ২- খাদ্যাভাব দূর করে না এমন ইঞ্জেকশন পুশ করা। ৩- জখমের চিকিৎসা করা। ৪- সুগন্ধি ব্যবহার করা। ৫- তেল ব্যবহার করা। ৬- মেহেদি লাগানো। ৭- চোখ, কান ও নাকে ড্রপ ব্যবহার করা। ৮- বমি করা। ৯- হিজামা বা সিঙ্গা লাগানো। ১০- ফ্লেবোটমি বা রগ থেকে রক্ত সংগ্রহ করা। ১১- রক্ত পরীক্ষা করানো। ১২- নাক থেকে রক্ত পড়া। ১৩- রক্তক্ষরণ হওয়া। ১৪- জখম হতে রক্ত নিঃসরিত হওয়া। ১৫- দাঁত তোলা। ১৬- মযি কিংবা ওদি[২] বের হওয়া। ১৭- টুথপেস্ট ব্যবহারের কারণে সিয়াম ভঙ্গ হয় না।

সিয়ামের কিছু সুন্নাহ-

১. সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির জন্য সেহরী খাওয়া সুন্নাহ। কারণ সেহরীতে রয়েছে বারাকাহ। একজন মুমিনের জন্য খেজুর কতই না উত্তম সেহরী! সেহরী দেরীতে খাওয়া সুন্নাহ।

২. অবিলম্বে ইফতার করা সুন্নাহ। সালাতের পূর্বে যেন (অন্তত) একটি খেজুর দিয়ে হলেও ইফতার হয়। খেজুর না থাকলে পানি দিয়ে ইফতার করবে। যদি পানি না পাওয়া যায় তাহলে যেকোন হালাল খাদ্য বা পানীয়

---

[১] চালের হিসাবে অর্ধ সা' দেড় কেজি।

[২] মযি বলা হয় যৌনোত্তেজনার কারণে লিঙ্গ হতে নির্গত পিচ্ছিল পদার্থ। ওদি বলা হয় অনেকের ক্ষেত্রে প্রস্রাবের পূর্বে বা পরে লিঙ্গ হতে নির্গত কিছুটা সাদা পদার্থ।

দ্বারা ইফতার করবে। তবে ইফতার করার জন্য যদি কিছুই না পাওয়া যায় তাহলে মনে মনে সিয়াম ভঙ্গ করার নিয়ত করবে।

৩. সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির জন্য বেশি বেশি যিকির ও দু'আ করা সুন্নাহ। সুতরাং তিনি ইফতার গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম নিবেন। ইফতার শেষ হলে আল্লাহর প্রশংসা করবেন। ইফতারের সময়ে তিনি বলবেন,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

(তৃষ্ণা দূর হলো। শিরাগুলো সীক্ত হলো এবং আল্লাহ চাহে তো সোয়াবও লাভ হলো।) আবু দাউদ[১]- ২৩৫৭।

৪. সিয়ামরত ব্যক্তি বা অন্য কেউ হোক সবার জন্যই সব সময়ে মেসওয়াক করা সুন্নাহ। দিনের শুরুতে ও শেষে।

৫. সিয়ামরত ব্যক্তিকে কেউ যদি গালি দেয় কিংবা তার সঙ্গে মারামারি করতে উদ্যত হয় তাহলে তার জন্য এই কথা বলে দেয়া সুন্নাহ যে, 'আমি তো সিয়ামরত ব্যক্তি, আমি তো সিয়ামরত ব্যক্তি।'

৬. সিয়ামরত ব্যক্তির জন্য বেশি বেশি নেক আমল করা সুন্নাহ। যেমন, যিকির, কোরআন তেলাওয়াত, দান-সাদাকাহ, নিঃস্ব ও প্রয়োজনগ্রস্ত ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়ানো, ইস্তেগফার ও তাওবা করা, তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ও রোগীর শুশ্রূষা করাসহ ইত্যাদি।

৭. রামাদান মাসে এশার সালাতের পর তারাবীর সালাত আদায় করা সুন্নাহ।

৮. রামাদানের শেষ ১০ দিনে বিভিন্ন ধরণের ইবাদাতের জন্য কষ্ট ও মুজাহাদা করা সুন্নাহ। এ সময়ে সারারাত জাগ্রত থাকবে। পরিবারকেও জাগ্রত রাখবে।

এছাড়াও রামাদান মাসে একজন মুসলিমের পালন করার মতো অনেক সুন্নাহ রয়েছে। স্থানস্বল্পতার কারণে সেগুলো উল্লেখ করা যাচ্ছে না। কিন্তু

---

[১] দু'আসম্বলিত হাদীসটি হাসান।

আমরা এই বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, রামাদান হলো নেক আমল করার একটি দরজা। সুতরাং রামাদান এলে আপনি কোমর বেঁধে নেমে পড়ুন। ইচ্ছাশক্তি ও মনোবলকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করুন। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করুন। মনে রাখবেন, ঐ লোকটি হতভাগা, যে রামাদান পেলো কিন্তু তাকে ক্ষমা করা হলো না।

আমরা আল্লাহর নিকট দু'আ করি, তিনি যেন আমাদেরকে ও আপনাকে ঐ সকল লোকের অন্তর্ভূক্ত করেন, যাদের সিয়াম ও আমলসমূহ তিনি কবুল করেছেন।

ইসলামের পঞ্চম রোকন হলো,

হজ্ব করা

অর্থাৎ “যদি পথ অতিক্রম করার সামর্থ্য হয় তখন বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে।”

হজ্বের সংজ্ঞা- আল্লাহর রাসুলের সুন্নাহয় যেভাবে এসেছে সে অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত স্থানে বিশেষ কিছু আমল করার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাত করাকে হজ্ব বলে।

হজ্বের হুকুম- হজ্ব ইসলামের অন্যতম রোকন ও বড় ফরজগুলোর একটি। কারণ আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الۡبَیۡتِ مَنِ اسۡتَطَاعَ اِلَیۡهِ سَبِیۡلًا.

{আর মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্ব করা তার জন্য অবশ্যকর্তব্য।} আলে ইমরান- ৯৭

হজ্ব জীবনে কতবার ফরজ হয়?

জীবনে হজ্ব একবারই ফরজ হয়। এর বেশি হজ্ব করলে তা নফল হজ্ব বলে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে আবু হুরায়রা রা. এর একটি হাদীসে আছে, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সা. আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করতে গিয়ে বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ ... فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ.

“হে লোকসকল! নিশ্চই আল্লাহ তোমাদের ওপর হজ্ব করা ফরজ করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্ব করবে। তখন এক লোক বলে উঠল, ইয়া রসুলাল্লহ! প্রত্যেক বছরই কি (হজ্ব ফরজ)? ...রাসুল সা. বললেন, যদি আমি ‘হাঁ’ বলি তাহলে (প্রতি বছর) ফরজ হয়ে যাবে এবং সেটা তোমরা পারবে না।” সহীহ মুসলিম- **১৩৩৭**। ওমরার ব্যাপারটিও এমন।

হজ্বের শর্তসমূহ- হজ্ব ফরজ হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে। **১.** মুসলিম হওয়া। ২. বালেগ হওয়া। ৩. বোধসম্পন্ন হওয়া ৪. স্বাধীন হওয়া এবং ৫. সামর্থবান হওয়া।

মিকাতসমূহ- মিকাতের শাব্দিক অর্থ সীমানা।
শরীয়াহর পরিভাষায় মিকাত বলা হয় ইবাদাতের স্থান বা সময়কে। সুতরাং মিকাত দুই প্রকার- কালবাচক ও স্থানবাচক।

হজ্ব ও ওমরার মিকাতে যামানী বা কালবাচক মিকাত-
ওমরা সারা বছরই আদায় করা যায়। তবে হজ্বের জন্য নির্দিষ্ট কিছু মাস রয়েছে। হজ্বের কার্যক্রমগুলো ঐ মাসগুলো ছাড়া অন্য কোন মাসে করলে সহীহ হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ.

{হজের সময় নির্দিষ্ট মাসসমূহ।} আল বাকারা- ১৯৭। মাসগুলো হলো, শাওয়াল, যিলকদ ও জিলহজ্ব।

হজ্ব ও ওমরার মিকাতে মাকানী বা স্থানবাচক মিকাত-
হজ্ব ও ওমরার মিকাতে মাকানী বা স্থানবাচক মিকাত বলা হয় এমন কিছু সীমানাকে, যে সীমানাগুলো একজন হাজ্বী ও ওমরা পালনকারী ব্যক্তির জন্য ইহরামব্যতীত অতিক্রম করা জায়েজ নয়। ইবনে আব্বাস রা. এর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসে রসুলুল্লাহ সা. এই মিকাতগুলো বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا.

"রসুলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বাঁধার স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, মদিনাবাসীদের জন্য যুল হুলাইফা, শামবাসীর জন্য জুহ্‌ফা, নজ্‌দবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল, ইয়েমেনবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম। উল্লিখিত স্থানসমূহ হজ্ব ও ওমরার নিয়্যাতকারী সেই অঞ্চলের অধিবাসী এবং ঐ সীমারেখা দিয়ে অতিক্রমকারী অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ইহরাম বাঁধার স্থান। মিকাতের ভিতরের লোকেরা নিজ বাড়ি থেকে ইহরাম বাঁধবে। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে।" সহীহ বুখারী- ১৪৫৪

সুতরাং যে ব্যক্তি ইহরাম ব্যতীত এই মিকাতগুলো অতিক্রম করবে তার জন্য আবশ্যক হলো পেছনে ফিরে যাওয়া, যদি সম্ভব হয়। আর যদি সে ফিরে যেতে না পারে তাহলে তার ওপর ফিদয়া ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ মক্কায় সে একটি ছাগল যবাই করবে এবং তা হারামে থাকা মিসকিনদের মাঝে বণ্টন করে দিবে। তবে যাদের ঘর মিকাতের ভেতরে তারা তাদের স্থানে থেকেই ইহরাম বাঁধবে। কারণ উক্ত হাদীসে রাসুল সা. বলেছেন, "মিকাতের ভিতরের লোকেরা নিজ বাড়ি থেকে ইহরাম বাঁধবে।"

হজ্বের রোকন চারটি-

১. ইহরাম। অর্থাৎ হজ্বের নিয়ত করা।

২. আরাফার ময়দানে অবস্থান করা।

৩. তাওয়াফে যিয়ারাহ করা। এটিকে তাওয়াফুল ইফাদাও (ফিরে আসার তাওয়াফ) বলা হয়। কেননা এই তাওয়াফটি আরাফার ময়দান থেকে ইফাদা বা ফিরে আসার পরই করা হয়। এটিকে আবার তাওয়াফুল ফারদ বা ফরজ তাওয়াফও বলা হয়। এটি সবার ঐক্যমতে একটি রোকন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ.

{তারপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে। তাদের মানত পূর্ণ করে এবং প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করে।} আল হাজ্ব- ২৯

৪. সাফা-মারওয়ায় সায়ী করা। এটিও একটি রোকন। বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা রা. এর হাদীসে বর্ণিত আছে তিনি বলেন,

مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ، وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

"আল্লাহ এমন ব্যক্তির হজ্ব ও ওমরা পূর্ণ করবেন না যে ব্যক্তি সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়ায়নি।" সহীহ মুসলিম- ১২৭৭। এছাড়াও নবী সা. বলেছেন,

اسْعَوْا، فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ.

"তোমরা সায়ী করো। কেননা আল্লাহ তোমাদের ওপর সায়ী ফরজ করেছেন।" মুসনাদে আহমাদ[১]- ২৭৩৬৭।

ওমরার রোকন তিনটি-

১. ইহরাম।

২. তাওয়াফ।

৩. সায়ী।

হজ্ব করার পদ্ধতি (সংক্ষেপে)-

মিকাতে পৌঁছার সময়ে মুহরিম ব্যক্তির জন্য নিষিদ্ধ এমন সব কিছু থেকে মুক্ত হতে হবে। সুতরাং পুরুষ লোক সাদা রঙের পরিচ্ছন্ন লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করবে। তবে একজন নারী যেকোন পোশাক পরতে পারবে। তারপর যে নুসুকটি[২] করতে চায় সেটির নিয়ত করবে। এরপর বাইতুল্লাহ সাতবার চক্কর দেওয়ার মাধ্যমে তাওয়াফ করবে। এমুহূর্তে কা'বা ঘরকে বাম পাশে রাখবে। এরপর সাফা-মারওয়ায় গিয়ে সাতবার সায়ী করবে। একবার গেলে একটি সায়ী এবং ফিরে এলে আরেকটি সায়ী ধরা হবে। সে যদি তামাত্তু'র নিয়ত করে থাকে তাহলে এরপর চুল কাটবে। অষ্টম দিন অর্থাৎ ইয়াওমুত তারউইয়ায় মিনায় অবস্থান করবে। নবম দিন হাজ্বী সাহেব আরাফার ময়দানের উদ্দেশ্যে রওনা করবে। সেখানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করবে। এরপর মুযদালিফায় ফিরে আসবে। মুযদালিফায় দশম দিনের সূর্য উদিত হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত অবস্থান করবে। এরপর মুযদালিফা থেকে ফিরে আসবে। তারপর যদি জামারাতে আসে তাহলে জামরাতুল আকাবায় সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে। তারপর 'হাদী' বা কোরবানীর পশু যবাই করবে। মাথা মুণ্ডাবে। তাওয়াফুল ইফাদা করবে।

---

[১] মুহাক্কিক বলেন, 'এই হাদীসটির শাহেদ ও বিভিন্ন 'ত্বরীক' থাকার কারণে তা হাসান'। প্রকা. মুআসসাতুর রিসালাহ।

[২] অর্থাৎ তামাত্তু' বা ইফরাদ বা কেরান। তামাত্তু' التمتع বলা হয় প্রথমে ওমরার নিয়ত করে ওমরা করে হালাল হয়ে যাওয়া। এরপর হজ্বের নিয়ত করে হজ্ব করা। কেরান القران বলা হয় ওমরা ও হজ্বের নিয়ত একই সঙ্গে করা এবং ওমরা করে হালাল না হওয়া। একেবারে হজ্ব শেষ করে হালাল হওয়া। ইফরাদ الإفراد বলা হয় শুধু হজ্বের নিয়ত করে হজ্ব করা।

এরপর তামাত্তু’ হজ্বকারী হলে সাফা-মারওয়ায় সায়ী করবে। যদি এফরাদ বা কেরান হাজ্বী হয় এবং তাওয়াফুল কুদুম বা প্রথম তাওয়াফের পর সায়ী না করে থাকে তাহলে তাকেও এই সায়ী করতে হবে।

তারপর এগারো ও বারো তারিখের রাত মিনায় কাটাবে। এটি ওয়াজিব। এগারো তারিখ দিনের বেলা তিনটি জামরায় পাথর নিক্ষেপ করবে। প্রথমে ছোট জামরা, এরপর মাঝারী ও এরপর সবচেয়ে বড় জামরায় পাথর নিক্ষেপ করবে। দ্বিতীয় দিনেও একই কাজ করবে। পাথর নিক্ষেপ করার সময় হলো, যাওয়ালের পর থেকে অর্থাৎ সূর্য মাঝ আকাশ থেকে হেলে যাওয়ার পর থেকে নিয়ে পরদিন সূর্য উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত। যদি তার তাড়া থাকে তাহলে বারো তারিখের সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই তাকে মিনা থেকে বের হতে হবে। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় মিনায় থাকা অবস্থায়ই যদি সূর্যাস্ত হয়ে যায় তাহলে তাকে তেরো তারিখের রাতে থেকে যেতে হবে। পরবর্তীতে সে যখন মক্কা থেকে বের হতে চাইবে তখন তাকে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে এবং এরই মাধ্যমে বাইতুল্লাহয় তার শেষ স্মৃতি বানাতে হবে তাওয়াফকে। তবে এই তাওয়াফ হায়েজ-নেফাসগ্রস্ত নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

ওমরা করার পদ্ধতি-

মিকাতে পৌঁছার সময়ে মুহরিম ব্যক্তির জন্য নিষিদ্ধ এমন সব কিছু থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। পুরুষ লোক সাদা রঙের দুইটি পরিচ্ছন্ন লুংঙ্গি ও চাদর পরিধান করবে। তবে একজন নারী যেকোন পোশাক পরতে পারবে। তারপর ওমরার নিয়ত করবে। বাইতুল্লাহ আসার পর সাতবার তাওয়াফ করবে। তারপর পূর্বে উল্লিখিত পদ্ধতিতে সাফা-মারওয়ায় সায়ী করবে। এরপর (পুরুষ) মাথা হলক করে ওমরা থেকে হালাল হয়ে যাবে।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়াদি-

মাথা মুণ্ডানো। নখ কাটা। পুরুষের জন্য মাথা ঢাকা এবং সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা। সুগন্ধি ব্যবহার করা। কোন স্থলপ্রাণী শিকার করা ও

শিকারকৃত প্রাণীকে হত্যা করা। বিবাহ করা। সহবাস করা। লজ্জাস্থান ব্যতীত স্ত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়া।

স্ত্রীলোকের জন্য নেকাব পরা জায়েজ নয়, কারণ নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ.

"মুহরিম মহিলা মুখে নেকাব এবং হাতে হাত মোজা পরবে না।" সহীহ বুখারী- **১৭৪১**

জিহাদ

জিহাদের সংজ্ঞা- জিহাদের **আভিধানিক** অর্থ হলো, সামর্থ, চেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করা।

পারিভাষিক অর্থে জিহাদ হলো, কাফের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চেষ্টা ও সামর্থ ব্যয় করা এবং তাদেরকে প্রতিহত করা।

ইসলামে জিহাদের অবস্থান ও জিহাদের তাৎপর্য-

জিহাদ হলো ইসলামের যুরওয়াতু সানাম (ذروة سنام) যেমনটি নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। যুরওয়াতু সানাম অর্থ হলো, সর্বোচ্চ চূড়া। জিহাদকে ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া বলার কারণ হলো, এর মাধ্যমে ইসলাম উন্নীত ও উঁচু হয় এবং প্রকাশ লাভ করে। আল্লাহ তাঁর রাস্তায় নিজের মাল ও জান খরচ করে জিহাদকারীদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তাদের সঙ্গে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ اشۡتَرٰی مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اَنۡفُسَهُمۡ وَ اَمۡوَالَهُمۡ بِاَنَّ لَهُمُ الۡجَنَّةَ.

{নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল এই বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।} আত তাওবাহ- **১১১**

জিহাদের বিধান এসেছে মানুষকে মূর্তি ও তাগুতের ইবাদাত থেকে মুক্ত করে শরীকবিহীন একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের পথে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে। এছাড়া জুলুম প্রতিহত করা এবং মজলুমের হক্ক ফিরিয়ে দেওয়াও জিহাদের বিধানের উদ্দেশ্য। জিহাদের বিধানের পেছনে আরো উদ্দেশ্য হলো, কাফেরদেরকে দুর্বল বা অবনমিত করা, তাদেরকে লাঞ্চিত করা, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করা এবং মুমিনদের অন্তরকে পরিশীলিত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَاتِلُوۡهُمۡ یُعَذِّبۡهُمُ اللّٰهُ بِاَیۡدِیۡكُمۡ وَ یُخۡزِهِمۡ وَ یَنۡصُرۡكُمۡ عَلَیۡهِمۡ وَ یَشۡفِ صُدُوۡرَ قَوۡمٍ مُّؤۡمِنِیۡنَ.

{তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের হাতেই তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন, তাদেরকে লাঞ্চিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন এবং মুমিনদের অন্তরকে তিনি পরিশীলিত করবেন।} আত তাওবাহ- **১৪**

জিহাদের হুকুম-

কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা সমস্ত মুসলিমের ওপর ফরজে কেফায়া। সুতরাং যদি যথেষ্টসংখ্যক মুসলিমগণ এই বিধান পালন করেন তাহলে বাকিদের থেকে জিহাদের আবশ্যকতা রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি কেউ পালন না করে তাহলে সবাই গোনাহগার হবে। কেননা এটি সমষ্টিগতভাবে ফরজ বিধান। সুনির্দিষ্টভাবে একেকজনের ওপর নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّه لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

{আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।} আল আনফাল- ৩৯। নবী সা. বলেছেন,

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ.

"যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেলো যে, সে কোনদিন জিহাদ করেনি এবং জিহাদের বাসনাও মনে আনেনি সে একরকম মুনাফেকীর ওপর মারা গেলো।" সহীহ মুসলিম- **১৯১০**

তবে কিছু কিছু সুরত রয়েছে যখন জিহাদ প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজে আইন হয়ে যায়। সুরতগুলো নিম্নরূপ-

প্রথম সুরত- যখন শত্রুপক্ষ মুসলিমদের কোন শহর আক্রমণ করে বসবে তখন ঐ শহরে অবস্থানরত মুসলিমদের ওপর আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করা ফরজে আইন হয়ে যাবে। যদি তাদের এতো সামর্থ না থাকে তাহলে শত্রুকে প্রতিহত করার ফরজিয়ত বা আবশ্যকতা নিকটবর্তী মুসলিমদের ওপর ওয়াজিব হবে। এভাবে তারাও যথেষ্ট না হলে তাদের নিকটে থাকা মুসলিমদের ওপর আবশ্যক হবে। এক পর্যায়ে সকল মুসলিমের ওপর এই শত্রুকে প্রতিহত করা ফরজে আইন হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

{তোমরা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হয়ে যাও এবং তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।} আত তাওবাহ- ৪১

দ্বিতীয় সুরত- যখন যুদ্ধের মুহূর্ত চলে আসে অর্থাৎ যখন দুইটি দলের মুখোমুখী সাক্ষাত ঘটে যায় তখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায় এবং যারা লড়াইয়ের ময়দানে উপস্থিত থাকবে তাদের জন্য ফিরে আসা ও শত্রুর মুখ থেকে পলায়ন করা হারাম হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡٓا اِذَا لَقِيۡتُمُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا زَحۡفًا فَلَا تُوَلُّوۡهُمُ الۡاَدۡبَارَ. وَ مَنۡ يُّوَلِّهِمۡ يَوۡمَئِذٍ دُبُرَه اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوۡ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدۡ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ مَاۡوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئۡسَ الۡمَصِيۡرُ.

{হে মুমিনগণ! তোমরা যখন কাফের বাহিনীর সম্মুখীন হবে পরস্পর নিকটবর্তী অবস্থায়, তখন তোমরা তাদের সামনে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। আর সেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা দলে যোগ দেয়া ছাড়া কেউ তাদেরকে পিঠ দেখালে সে তো আল্লাহর গজব নিয়েই ফিরল এবং তার আশ্রয় জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ট ফিরে যাওয়ার স্থান।} আল আনফাল- ১৫, ১৬। এই বিধান হতে বাদ যাবে নতুন কৌশল অবলম্বনকারী ও পেছনের দলে যোগদানকারী ব্যক্তি।

তৃতীয় সুরত- যদি খলীফাতুল মুসলিমীন সবাইকে সুনির্দিষ্টভাবে জিহাদের জন্য বের হতে বলেন। একই বিধান প্রযোজ্য হবে যদি সকল মুসলিমেরই বের হওয়ার প্রয়োজন পড়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَا لَكُمۡ اِذَا قِيۡلَ لَكُمُ انۡفِرُوۡا فِيۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اثَّاقَلۡتُمۡ اِلَى الۡاَرۡضِ ؕ اَرَضِيۡتُمۡ بِالۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا مِنَ الۡاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا فِى الۡاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيۡلٌ. اِلَّا تَنۡفِرُوۡا يُعَذِّبۡكُمۡ عَذَابًا اَلِيۡمًا ۙ وَّ يَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ وَ لَا تَضُرُّوۡهُ شَيۡـًٔا ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ.

{হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন তোমাদেরকে বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন তোমরা যমীনের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়ো? তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। যদি তোমরা অভিযানে বের না হও, তবে তিনি

তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং অন্য জাতিকে তোমাদের পরিবর্তে নিয়ে আসবেন এবং তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।} আত তাওবাহ- ৩৮, ৩৯। এছাড়াও নবী সা. বলেছেন,

وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا.

"আর যখন তোমাদেরকে বের হতে বলা হবে তখন তোমরা বের হয়ে পড়বে।" সহীহ বুখারী- **১৭৩৭**

জিহাদ কার ওপর ওয়াজিব?

প্রত্যেক মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক, বোধসম্পন্ন, পুরুষলোক, স্বাধীন এবং শারীরিক ও আর্থিকভাবে সামর্থবান ব্যক্তির ওপর জিহাদ ফরজ।

একটি মাসআলা- জিহাদ ফরজে আইন হলে কি বাবা-মায়ের অনুমতি নেওয়া আবশ্যক? জিহাদ যখন ফরজে আইন হয়ে যাবে তখন খলিফাতুল মুসলিমীন, বাবা-মা এবং ঋণদাতার অনুমতি নেওয়া হবে না। বরং অস্ত্র বহন করতে পারে এমন প্রত্যেকের ওপরই তখন লড়াই করা ফরজ হয়ে যাবে।

মাসআলা- জিহাদ না করে বসে থাকা কিছু ব্যক্তি জিহাদ না করার স্বপক্ষে একটা হাদীস পেশ করে থাকে। হাদীসটি হলো,

رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر.

"আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদে ফিরে এসেছি।" অথচ এটি একটি বাতিল ও জাল হাদীস। এই হাদীসের কোন ভিত্তি নেই।

হে আল্লাহর বান্দা! এতো কিছু শোনার পর আপনার মাঝে যদি জিহাদের শর্তগুলো পাওয়া যায় তাহলে আপনি প্রথমে এই নেয়ামতের ব্যাপারে আল্লাহর প্রশংসা করুন। তারপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের জন্য উঠে যান। আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের পদ্ধতি হলো, আপনি আল্লাহর রাস্তায় আপনার জান কোরবান করবেন এবং এমন সব উপকরণ গ্রহণ করবেন যা আপনাকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও শাস্তি হতে দূরে রাখবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ. تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِه وَ تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

{হে ঐ সকল লোক যারা ঈমান এনেছো, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসা দেখিয়ে দেবো যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে রক্ষা করবে? তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা জানতে।} আস সফ্- **১০, ১১**

পরিশিষ্ট

হে আমার মুসলিম ভাই! আপনি আপনার দ্বীন শেখা ও তদানুযায়ী আমল করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠুন। কারণ এতেই রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّه حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

{যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, পুরুষ হোক বা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবো।} আন নাহল- ৯৭। আপনি যে হাদীসটির বক্তব্য জানলেন তা মুখস্থ রাখার কোশেশ করুন। এই মহান হাদীসটি অনেক বিষয়কে একীভূত করার কারণে এবং এতে অনেক ফায়দা থাকার কারণেই আমরা আপনার সামনে এই হাদীসটি উপস্থাপন করেছি।

আপনাকে একটি ব্যাপার জানতে হবে। আর তা হলো, আপনি এই বিষয়গুলো জানেন বা না জানেন আপনাকে আল্লাহ এ ব্যাপারে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবেন। রাসুল সা. বলেছেন,

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ.

"কোন বান্দার পদদ্বয় কিয়ামত দিবসে ততক্ষণ পর্যন্ত সরবে না, যতক্ষণ না তাকে এ কয়টি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, কিভাবে সে তার জীবনকালকে অতিবাহিত করেছে; তার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কী আমল করেছে; কোথা হতে তার ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে; কোন কোন খাতে তা ব্যয় করেছে এবং কী কী কাজে তার দেহ ক্ষয় করেছে?" সুনানে তিরমিযী[১]- ২৫৮৪

---

[১] মুহাক্কিক বলেন, হাদীসটি সহীহ লিগইরি। তবে এই সনদটি হাসান। প্রকা. দারুর রিসালাহ। মূল আরবি কিতাবে হাদীসটির কিছু শব্দে ভিন্নতা আছে। তবে অর্থগত দিক দিয়ে এখানে উল্লিখিত হাদীসটির সঙ্গে উল্লেখযোগ্য কোন ভিন্নতা নেই। -অনুবাদক।

আমরা আমাদের জীবনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবো, কীসের মাঝে তা আমরা নিঃশেষ করেছি। আমরা যে ইলম শিখলাম সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবো এর ওপর আমরা কী আমল করেছি? আমরা যদি আমাদের সময়গুলোকে গনীমত মনে করে সদ্ব্যবহার না করি এবং আমরা আমাদের দ্বীন সম্পর্কে যা শিখলাম তা যদি বাস্তবায়ন না করি এবং আমাদের চারপাশের মানুষদের নিকট এগুলো তাবলীগ না করি তাহলে আমাদের কোন উপায় নেই। নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ.

“আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে সজীব করুন, যে আমার কথা শ্রবণ করেছে, তা মুখস্থ ও ধারণ করেছে এবং তা অন্য কাউকে পৌঁছে দিয়েছে। কারণ কোন কোন ফিকহ (দ্বীনের গভীর জ্ঞান) ধারণকারী ব্যক্তি নিজেও ফকীহ নয় আবার কোন কোন ফিকহ ধারণকারী ব্যক্তি এমন ব্যক্তির নিকট ফিকহ পৌঁছে দেয় যে কিনা তার চেয়েও বড় ফকীহ।” মা’রিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার[১]- ১/১০৯।

আমরা আল্লাহর কাছে দু’আ করি, আল্লাহ যেন আমাদেরকে এবং আপনাকে ঐ ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত করেন যারা কোন কথা শ্রবণ করে সেখান থেকে উত্তমটি অনুসরণ করে। তারাই ঐ সকল লোক, আল্লাহ যাদেরকে হিদায়াত দান করবেন। আর তারাই হলো বুদ্ধিসম্পন্ন।

আল্লাহই ভালো জানেন

ও সল্লাল্লহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়ালা আলিহি ওয়া সহবিহী আজমায়ীন।

কিতাব শেষ

[১] হাদীসটি হাসান। প্রকা. জামি’আতুদ দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ, করাচী।

আল হামদুলিল্লাহ ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু আলা রসুলিল্লাহ!

কিতাবটি অনুবাদ করতে গিয়ে ভুল ত্রুটি হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ করে টীকা লেখার ক্ষেত্রে যদি কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। অনুবাদকের জন্য দু'আ করবেন আশা করি।

আসুন দ্বীন
সম্পর্কে জানি